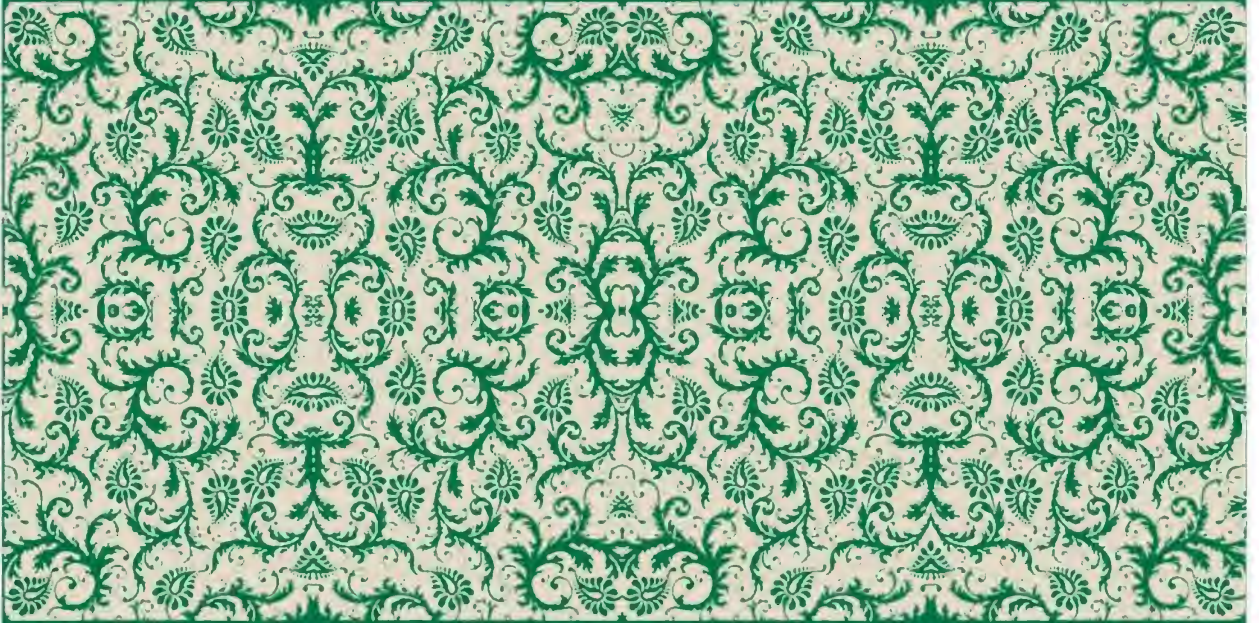
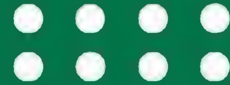
সাহিত্য কণিকা

অষ্টম শ্রেণী







জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সাহিত্য কণিকা

অষ্টম শ্রেণী

সংকলন ও রচনা

শামসুল কবীর

মাহবুবুল আলম

সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

সংশোধন ও পরিমার্জন

গৌরাঙ্গ লাল সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ : নভেম্বর, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
ফাইন ডট লিঃ

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা–করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বাংলা একটি আবশ্যিক বিষয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। তাই নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন করতে হলে এ ভাষায় ব্যবহারিক ও সৃজনশীল–উভয় দিকেই শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকে হতে হবে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। আমরা আশা করি, অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য কণিকা'য় বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ করে উক্ত চেতনায় উজ্জীবিত হতে পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে কিছু বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সৃজনশীল প্রশ্নের কিছু কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫–৯৬ সালে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথা পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা হয়নি।

বিষয়টি বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সফল ও অর্থবহ করার জন্য এসএসসি পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের আলোকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় মোট নম্বরের শতকরা ৮০ ভাগ প্রশ্ন স্মৃতিনির্ভর, যা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে উত্তর দেয়। অবশিষ্ট অধিকাংশ প্রশ্ন অনুধাবন স্তরের। প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্ন খুবই কম। প্রচলিত এ পরীক্ষা পদ্ধতি মূলত শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতাকে মূল্যায়ন করে আসছে।

বস্তুত মুখস্থ, সাজেশন এবং নোট নির্ভর এ পরীক্ষাপদ্ধতি শ্রেণীকক্ষের শিখন শেখানো কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে বুঝে লেখাপড়ার পরিবর্তে মুখস্থ করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। আর এ মুখস্থ করাও একটি কঠিন কাজ এবং এতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভাবিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এ সব কারণে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও মেধার যথার্থ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পাঠলব্ধ জ্ঞান ও অনুধাবনকে নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ এবং উপাত্ত ও ঘটনা বিচার–বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য যাচাই করার মতো ব্যবস্থা প্রশ্নপত্রে থাকা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সৃজনশীল প্রশ্নের অবতারণা।

প্রশ্নপত্রে পরিবর্তন

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তিন ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন। পরীক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং সংক্ষিপ্ত–উত্তর ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন প্রবর্তন করা হচ্ছে।

দক্ষতাভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❒ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের (MCQ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০% নম্বরের পরিবর্তে ৪০% বরাদ্দ থাকবে। তবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫%, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০% এবং কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫% নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

❒ বর্তমানে প্রচলিত শুধু সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঙ্গে বহুপদি সমাপ্তিসূচক (Multiple Completion) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক (Situation Set) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

❒ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের জ্ঞান বা মনে রাখার জন্য ৪০%, অনুধাবন বা বুঝে লেখার জন্য ৩০%, অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবনকে প্রয়োগ করার জন্য ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতার তথা বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণ বা মূল্যায়নের জন্য ১০% প্রশ্ন থাকবে।

❒ শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক ছক (Specification Grid) অনুসরণ করা হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন

প্রচলিত ৫০% নম্বরের সংক্ষিপ্ত–উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্নের পরিবর্তে ৬০% নম্বরের সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তন। ব্যতিক্রম হিসেবে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে এমন বিষয়ে ৪০% সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে মৌলিক অর্থাৎ যা পূর্বে কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন প্রক্রিয়া

- ❒ সৃজনশীল প্রশ্ন একটি দৃশ্যকল্প/উদ্দীপক, সূচনা বক্তব্য (*Stem* বা Scenario) দিয়ে শুরু হবে।
- ❒ দৃশ্যকল্প/উদ্দীপকটি কোনো ঘটনা, গল্প, চিত্র, মানচিত্র, গ্রাফ, সারণি, পেপার কাটিং, ছবি, উদ্ধৃতি, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি হতে পারে।
- ❒ দৃশ্যকল্প হবে মৌলিক (Unique)। পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি এ দৃশ্যকল্পটি থাকবে না। তবে বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দৃশ্যকল্প রচনায় পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করা যাবে।
- ❒ দৃশ্যকল্পটি শিক্ষাক্রমের/পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে হতে হবে।
- ❒ দৃশ্যকল্পটি আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য হতে হবে।
- ❒ দৃশ্যকল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে প্রশ্নের অংশগুলো তৈরি হবে এবং প্রতিটি অংশ সহজ থেকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে হবে।
- ❒ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তরের (ক–অংশ: জ্ঞান, খ–অংশ: অনুধাবন, গ–অংশ: প্রয়োগ ও ঘ–অংশ: উচ্চতর দক্ষতা) সমন্বয়ে গঠিত হবে।
- ❒ গণিত, উচ্চতর গণিত এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের তিন স্তরের (সহজ, মধ্যম এবং কঠিন) সমন্বয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন গঠিত হবে।
- ❒ দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থাকবে না, তবে উত্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা থাকবে।
- ❒ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের মোট নম্বর হবে ১০।

একটি সৃজনশীল প্রশ্নের বিভিন্ন অংশে নম্বর বন্টন

প্রশ্নের অংশ	চিন্তন দক্ষতার স্তর	নম্বর
ক.	**জ্ঞান দক্ষতা** কোনো ঘটনা, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রকারভেদ ইত্যাদি স্মরণ করা বা মুখস্থ করে লিখতে পারার দক্ষতাকে জ্ঞান স্তরের দক্ষতা বোঝায়।	১
খ.	**অনুধাবন দক্ষতা** কোনো অনুচ্ছেদ, কবিতা, প্রবন্ধ, লেখচিত্র ইত্যাদি পড়ে বুঝতে পারা, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ, কোনো কিছু একটা নিয়মে সাজানো, নিয়ম ও বিধি, তথ্য, তত্ত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি পাঠ্যবই হতে হুবহু মুখস্থ না করে বুঝে নিজের ভাষায় উত্তর করার দক্ষতাকে অনুধাবন স্তরের দক্ষতা বলে।	২
গ.	**প্রয়োগ দক্ষতা** এটি হল কোনো অর্জিত জ্ঞান এবং অনুধাবন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দক্ষতা। সূত্র, নিয়ম–বিধি ইত্যাদি প্রয়োগ করে নতুন পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে পারার দক্ষতাকে প্রয়োগ স্তরের দক্ষতা বলে।	৩
ঘ.	**উচ্চতর দক্ষতা** কোনো বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন করার দক্ষতা হল উচ্চতর দক্ষতা। আন্তঃসম্পর্ক, সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য নির্ণয়, তুলনা করা, পার্থক্য করা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তৈরি করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া, কোনো সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা, মতামত প্রদান, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তরের অন্তর্ভুক্ত।	৪

সূচিপত্র



কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসে নি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। বাংলা ভাষার আগেও এ-দেশে ভাষা ছিল। সে-ভাষায় এ-দেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে-ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

আজ থেকে এক শ বছর আগেও কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ-ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথামতো চলে নি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটে নি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাংলার? এ-সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে-ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ করা যায় গভীর মিল। এ–ভাষাগুলো যে–সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ–ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী–ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা–শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে; অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্থ করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে–ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে–ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। ওই ভাষার নাম 'সংস্কৃত', অর্থাৎ বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ–ভাষা বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ–ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবদ্ধ হতে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ–ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ–প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা— বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন পূর্ব–মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড় অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার।

লেখক-পরিচিতি

হুমায়ুন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার রাড়িখাল গ্রামে। একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তিনি তাঁর শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসেবে তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে 'বাক্যতত্ত্ব' ও কিশোর পাঠকদের জন্য তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ 'লালনীল দীপাবলি', 'কতো নদী সরোবর'। তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থের মধ্যে 'অলৌকিক ইস্টিমার' ও 'জ্বলো চিতাবাঘ' উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৮৭ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' লাভ করেন। হুমায়ুন আজাদ ১২ই আগস্ট ২০০৪ তারিখে জার্মানির মিউনিখ শহরে মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

তরু – বৃক্ষ, গাছ।

উদ্ভূত – উৎপন্ন, জাত।

শতাব্দী – এক শ বছর।

বিধিবদ্ধ – নিয়ম দ্বারা শাসিত, নিয়মের অধীন।

ঘনিষ্ঠ – নিকট, নিবিড়, খুব কাছের।

উৎপত্তি – সূচনা, শুরু, জন্ম।

উদ্ভব – সূচনা, জন্ম, অভ্যুদয়, উৎপত্তি।

দুর্বোধ্য – যা বোঝা কঠিন, সহজে বোঝা যায় না এমন।

ভাষাতাত্ত্বিক – ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন।

শ্লোক – সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিতা, পদ্য।

টীকা

ভাষাবংশ – উৎপত্তি অনুসারে গোটা দুনিয়ার ভাষাগুলোকে কয়েকটি বড় রকমের বংশে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক-একটি ভাষাবংশকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করে লেখা হয়। যে ভাষাগুলো মানুষের মুখে এখন বেঁচে আছে বা বেঁচে নেই তার সবগুলোই এই ভাষাবংশ বা ভাষাগোষ্ঠীর ভেতরে পড়ে। ধ্বনি ও শব্দ বিচারে ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার মধ্যে মিল রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। এই বংশের একটি শাখা হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা।

ঋগ্বেদ – (ঋক্ + বেদ) – ঋক কথাটির অর্থ ছন্দে রচিত মন্ত্র বা শ্লোক। আর বেদ কথাটির অর্থ হচ্ছে যার মধ্যে বিধৃত রয়েছে জ্ঞান। বেদকে প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি চারটি ভাগে বিভক্ত— ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। এর মধ্যে ঋগ্বেদ হচ্ছে প্রধান বেদ।

বৈদিক ভাষা – বেদের ভাষাকে বৈদিক ভাষা বলা হয়। বেদের ভাষা ছিল খুব পবিত্র। মানুষের মুখে তা প্রচলিত ছিল না।

প্রাকৃত – সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা। বেদের ভাষা ও সংস্কৃত ছিল লেখা ও পড়ার ভাষা। প্রাকৃত ছিল জনসাধারণের প্রতি দিনের কথার ভাষা।

অপভ্রংশ – অপভ্রংশ বলতে মূল ভাষার শব্দাবলির বিকৃত বা অশুদ্ধ রূপকে বোঝানো হয়। অপভ্রংশ হচ্ছে প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন– আয়ার্ল্যান্ডে জন্ম খ্যাতিমান ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁর এই গবেষণা Linguistic Survey of India নামে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

পাণিনি– বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পেশোয়ার অঞ্চলে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'অষ্টাধ্যায়ী' নামে পরিচিত ব্যাকরণগ্রন্থে তিনি প্রায় চার হাজার ব্যাকরণসূত্র লিপিবদ্ধ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও পাণিনির মনীষা ও জ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – ভাষাবিদ পণ্ডিত ও গবেষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)'-বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশবিষয়ক একটি বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ – ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও গবেষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ (প্রধান) ছিলেন। তাঁর রচিত গবেষণাগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত', 'বাংলা ভাষার আঞ্চলিক অভিধান' উল্লেখযোগ্য।

পাঠ-পরিচিতি

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধটি হুমায়ুন আজাদের 'কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে

সঙ্গো শব্দের অর্থেরও। এক সময় ধারণা করা হত বাংলা এসেছে সংস্কৃত থেকে। তখনকার দিনে সংস্কৃত ছিল উঁচুশ্রেণীর মানুষের লেখার ভাষা। সাধারণ মানুষ কথা বলত প্রাকৃত ভাষায় আর এ প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষাবংশের একটি হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর বিকৃত রূপ হচ্ছে অপভ্রংশ। ডঃ সুনীতিকুমার মনে করেন, পূর্ব–মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, গৌড়ী প্রাকৃতের পরিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপভ্রংশ। গৌড়ী অপভ্রংশ থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলা ভাষা।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী বাংলা ভাষার জন্মকথা জানতে পারবে। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তার মমত্ববোধ জাগবে এবং সে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
   - ক. বাক্যতত্ত্ব
   - খ. কতো নদী সরোবর
   - গ. লালনীল দীপাবলি
   - ঘ. বাক্যতত্ত্ব

২. বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে
   - ক. বদলাতে বদলাতে
   - খ. কোনো এক শুভ সময়ে
   - গ. আকস্মিকভাবে
   - ঘ. পণ্ডিতদের চেষ্টায়

৩. সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য হল, এই ভাষায়—
   - ক. সাধারণ মানুষ কথা বলত
   - খ. উচ্চ শ্রেণীর মানুষ লিখত
   - গ. সাধারণ মানুষ লিখত
   - ঘ. উচ্চ শ্রেণীর মানুষ কথা বলত

৪. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম
   - ক. সংস্কৃত
   - খ. প্রাকৃত
   - গ. মৈথিলি
   - ঘ. বৈদিক

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন—
   - ক. সাহিত্যিক
   - খ. গবেষক
   - গ. সম্পাদক
   - ঘ. পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা

৬. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কোনগুলো?
   - ক. বৈদিক ও সংস্কৃত
   - খ. বাংলা ও সংস্কৃত
   - গ. প্রাকৃত ও অবহট্ট
   - ঘ. হিন্দি ও গুজরাটি

৭. ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে ও শব্দে মিল লক্ষ করা যায় কেন?
   ক. এই ভাষার লোকেরা একই অঞ্চলে বাস করত
   খ. ভাষাগুলো একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে
   গ. ভাষাগুলো একই ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য
   ঘ. কাকতালীয়ভাবে এই মিল সংগঠিত হয়েছে

৮. প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম কী?
   ক. অপভ্রংশ   খ. মাগধী
   গ. বাংলা   ঘ. সংস্কৃত

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

ভাষা স্রোতবাহী নদীর মতো গতিশীল। নদী যেমন চলতে চলতে মোড় বদলায়, বাঁক নেয়, ভাষাও তেমনি। মানুষের মুখে মুখে বদলাতে বদলাতে ভাষা নতুন রূপ নেয়। এভাবে সৃষ্টি হয় নতুন ভাষার। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা দেখিয়েছেন কত রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলা ভাষার উদ্ভব।

   ক. বাংলা ভাষার একজন গবেষকের নাম লেখ।
   খ. ভাষাকে স্রোতবাহী নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?—ব্যাখ্যা কর।
   গ. উদ্ধৃতির অংশটি কীভাবে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' নামক প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত?'—তোমার যৌক্তিক মতামত তুলে ধর।
   ঘ. বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

বাংলাদেশে অনেকগুলো আঞ্চলিক ভাষা আছে। এই ভাষাগুলোর একটি থেকে আর একটির পার্থক্য রয়েছে। যেমন সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা, নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষা, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা। কালক্রমে কোনো একটি বা একাধিক আঞ্চলিক ভাষা এত দূর আলাদা হয়ে উঠতে পারে যে তখন আর একে বাংলা ভাষা বলা যাবে না। এভাবে তৈরি হয় নতুন ভাষা। প্রাকৃত ভাষা থেকে এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাংলা ভাষা। এভাবে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষা কোনো কোনো ভাষা-বংশের উত্তরসূরি।

   ক. ভাষা-বংশ কী?
   খ. নতুন ভাষা তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
   গ. উদ্ধৃতিটির আলোকে বাংলা ভাষার জন্মকথা পর্যালোচনা কর।
   ঘ. উদ্ধৃতিটিতে নতুন ভাষা তৈরির যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে 'বাংলা ভাষার জন্মকথা' প্রবন্ধের আলোকে তার যৌক্তিকতা তুলে ধর।



খাদ্যশস্যের পরেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে যে জিনিসটি অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে, তা হল এখানকার কুটিরশিল্প। এক সময়ে ঘর-গৃহস্থালির নিত্য ব্যবহারের প্রায় সব পণ্যদ্রব্যই এদেশের গ্রামের কুটিরে তৈরি হত। আজও অনেক কিছুই হয়। এগুলো কুটিরশিল্পের মাধ্যমে তৈরি হলেও শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের সামগ্রী লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য।

আমাদের দেশের বিভিন্ন লোকশিল্পের কতকগুলো এক সময়ে এমন উচ্চমানের ছিল যে, আজও আমরা সেসব জিনিসের কথা স্মরণ করে গর্ববোধ করি।

প্রথমে বলতে হয় ঢাকাই মসলিনের কথা। ঢাকা শহরের অদূরে ডেমরা এলাকার তাঁতিদের এ অমূল্য সৃষ্টি এক কালে দুনিয়া জুড়ে তুলেছিল প্রবল আলোড়ন। ঢাকার মসলিন তৎকালীন মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল। মসলিন কাপড় এত সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে বোনা হত যে, ছোট্ট একটি আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে কয়েক শ গজ মসলিন কাপড় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। শুধু কারিগরি দক্ষতায় নয়, এ ধরনের কাপড় বুনবার জন্য শিল্পীমন থাকাও প্রয়োজন। আজ সেই মসলিন নেই। তবে মসলিন যারা বুনত, তাদের বংশধররা যুগ যুগ ধরে এ শিল্পধারা বহন করে আসছে বলে জামদানি শাড়ি আমরা আজও দেখতে পাই। বর্তমান যুগে জামদানি শাড়ি দেশে-বিদেশে শুধু পরিচিতই নয়, গর্বের বস্তু।

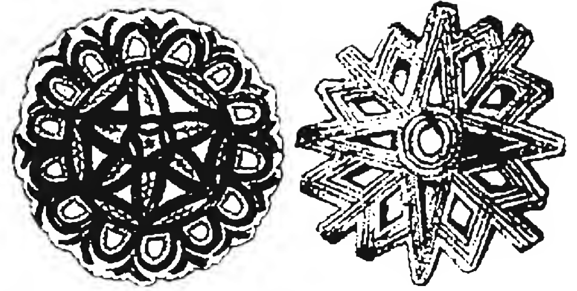
এমনি আর একটি গ্রামীণ লোকশিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। এটি হল নকশিকাঁথা। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এ নকশিকাঁথা তৈরির রেওয়াজ ছিল। এক-একটি সাধারণ আকারের নকশিকাঁথা সেলাই করতেও কমপক্ষে ছ মাস লাগত। বর্ষাকালে যখন চারদিকে পানি থৈ থৈ করে, ঘর থেকে বাইরে বের হওয়া যায় না, এমন মৌসুমই ছিল নকশিকাঁথা সেলাইয়ের উপযুক্ত সময়। মেয়েরা সংসারের কাজ সাঙ্গ করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাটি বিছিয়ে পানের বাটাটি পাশে নিয়ে পা মেলে বসতেন এ বিচিত্র নকশা তোলা কাঁথা সেলাই করতে। পাড়া-পড়শিরাও সুযোগ পেলে আসত গল্প করতে। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। এমনি এক-একটি কাঁথা সেলাই কত গল্প, কত হাসি, কত কান্নার মধ্যে দিয়ে শেষ হত তা বলা যায় না। শুধু কতকগুলো সূক্ষ্ম সেলাই আর রং-বেরঙের নকশার জন্যই নকশিকাঁথা বলা হয় না বরং কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক-একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা।

আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সব এলাকাতেই আছে; তবে ঢাকা, টাঙ্গাইল, সাজাদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় তাঁতশিল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।



জামদানি শাড়ির কথা আমরা আলোচনা করেছি। নারায়ণগঞ্জ জেলার নওয়াপাড়া গ্রামেই জামদানি কারিগরদের বসবাস। শতাব্দীকাল ধরে এ তাঁতশিল্প বিস্তার লাভ করেছে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী এ এলাকায়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ শীতলক্ষ্যা নদীর পানির বাষ্প থেকে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি হয় তা জামদানি বোনার জন্য শুধু উপযোগীই নয়, বরং এক অপরিহার্য বস্তু বলা চলে। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির জন্য শুধু অতীতের তাঁতিদের তাঁতশিল্পই নয়, বর্তমানের বড় বড় কাপড়ের কারখানাও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে।

কুমিল্লা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে প্রস্তুত খাদি বা খদ্দরের সমাদর শুধু গ্রামজীবনেই নয়, শহরের আধুনিক সমাজেও যথেষ্ট রয়েছে। খাদি কাপড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর সবটাই হাতে প্রস্তুত। তুলা থেকে হাতে সুতা কাটা হয়। গ্রামবাসীরা অবসর সময়ে সুতা কাটে। এদের বলা হয় কাটুনি। গ্রামে বাড়ির আশেপাশে তুলার গাছ লাগানোর রীতি আছে। সেই গাছের তুলা দিয়ে সুতা কাটা ও হস্তচালিত তাঁতে এসব সুতায় যে কাপড় প্রস্তুত করা হয়, সেই কাপড়ই প্রকৃত খাদি বা খদ্দর। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিদেশি কাপড় বর্জন করে দেশি কাপড় ব্যবহারের যে আদর্শ প্রবর্তিত হয়েছিল তারই সাফল্যের স্বাক্ষর এই খাদি।



পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, রামগড় এলাকার চাকমা, কুকি ও মুরং মেয়েরা এবং সিলেটের মাছিমপুর অঞ্চলের মণিপুরী মেয়েরা তাদের নিজেদের ও পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্র বুনে থাকে। এ কাপড়গুলো সাধারণত মোটা ও টেকসই হয়। নকশা, রং ও বুননকৌশল সবই তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী হয়।



বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। আজও শত শত গ্রাম্য কারিগর তৈরি করে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র। প্রথমে মাটির ছাঁচ করে তার মধ্যে ঢেলে দেয় গলিত কাঁসা। ধীরে ধীরে এ গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তখন ওপর থেকে মাটির ছাঁচটি ভেঙে ফেললেই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি।

তারপর এগুলো পালিশ করা হয়। এ ধরনের বাসনে নানারকম ফুল–পাতার নকশা বা ফরমাশকারীর নাম খোদাই করা থাকে। এমনকি আজকাল অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসেবে তামা পিতলের ঘড়া, থালা, ফুলদানি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোড়ামাটির কাজের ঐতিহ্য এদেশে বহু যুগের। মাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, দইয়ের ভাঁড়, রসের ঠিলা, সন্দেশ ও পিঠার ছাঁচ, টেপা পুতুল, হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদির মূর্তি গড়বার কাজে বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমোরপাড়ার অধিবাসীরা সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট, কৌটা, বাক্স বা ঘর সাজাবার নানা ধরনের শৌখিন সামগ্রী সব কিছুই মাটি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া পুরাকালের মসজিদ বা মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায়, তা এদেশের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

প্রতীকধর্মী মাটির টেপা পুতুলগুলোর মধ্যে শত শত বছর পূর্বের পাল বা কুমোরদের যে কারিগরি বিদ্যা এবং শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা অভাবনীয়।

কাঠের কাজের খুব বেশি শিল্পগুণ আজকাল দেখা না গেলেও অতীতের কিছু কিছু নমুনা যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ দেশে এক সময় গৃহনির্মাণের কাজে কারুকার্যে ভূষিত কাঠের ব্যবহার ছিল। বিশেষ করে পুরাতন খাট–পালঙ্ক, খুঁটি–দরজা ইত্যাদির নমুনা আজও দেখা যায়। এ ধরনের কাজকে বলা হয় হাসিয়া। বরিশালের কাঠের নৌকার কাজও বেশ নিপুণতার দাবি রাখে।

খুলনার মাদুর এবং সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে ব্যবহারে আরামদায়ক বলেই নয়, শীতলপাটির নকশা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অতীতে শীতলপাটির বহু দক্ষ কারিগর ছিল। এ শিল্পীদের দিয়ে এককালে ঢাকার নবাব পরিবার হাতির দাঁতের শীতলপাটি তৈরি করিয়েছিলেন। ঢাকার জাদুঘরে তা সংরক্ষিত আছে। এটি আমাদের লোকশিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন।

আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে যে শিকা, হাতপাখা, ফুলপিঠা তৈরি করা হয়, তা মোটেই অবহেলার জিনিস নয়। এদের বিচিত্র নকশা, রং এবং কারিগরি সৌন্দর্যের যে নিদর্শন চোখে পড়ে তা শুধু আমাদের অতি আপন বস্তুই নয়, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এদের স্থান বহু উচ্চে। সাধারণ সামগ্রী হলেও যাঁরা এগুলো তৈরি করেন তাঁদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রকাশ ঘটে এসব জিনিসের মধ্য দিয়ে। শিকা গৃহস্থালির জিনিসপত্তর ঝুলিয়ে রাখার জন্য তৈরি একথা সকলেই জানে। শুধু শুধু প্রয়োজন মিটলেই মন ভরে না বলে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ নানা নকশা জুড়ে দিয়ে তাকেও একটি বিশেষ শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে।

আমাদের দেশে বাঁশ অপ্রতুল নয়। বাঁশের নানারকম ব্যবহার ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না। ছোটখাটো সামান্য হাতিয়ারের সাহায্যে আমাদের কারিগররা বাঁশ দিয়ে আজকাল আধুনিক রুচির নানা ব্যবহারিক সামগ্রী তৈরি করছে যা শুধু আমাদের নিজেদের দেশেই নয়, বিদেশেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া সোলাশিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনাও দেখা যায় পুতুল, টোপর ইত্যাদির মধ্যে।

কাপড়ের পুতুল তৈরি করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ। অনেকাংশে এসব পুতুল প্রতীকধর্মী। অবশ্য আজকাল বাস্তবধর্মী কাপড়ের পুতুল তৈরিও শুরু হয়েছে। এগুলো যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি বিদেশি পয়সাও উপার্জন করে।

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

আমাদের সকলকেই আজ আপন পরিবেশ এবং পরিস্থিতির দিকে শুধু চোখ দিয়ে তাকালে হবে না, হৃদয় দিয়েও তাকাতে হবে। লোকশিল্পের ভিতর দিয়ে হৃদয়–মনের প্রকাশ হলে তা বিদেশিদের হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। এভাবে দেশে দেশে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজেও আমাদের লোকশিল্প সাহায্য করতে পারে।

লেখক-পরিচিতি

কামরুল হাসান ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। একজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে দেশে–বিদেশে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা ছবিতে এদেশের লোকজ জীবনের নানা উপাদান আমাদের ঐতিহ্য–সচেতন করে। লোকশিল্প সংরক্ষণেও তাঁর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। কর্মজীবনে তিনি সুদীর্ঘকাল ঢাকা চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। পরে তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের ডিজাইন সেন্টারের প্রধান কারুকার নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকশিল্পের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন। ছবি আঁকার বিচিত্র কলাকৌশল এবং লোকশিল্পের নানা দিক সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য লেখা পত্র–পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কামরুল হাসান মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

পণ্যদ্রব্য – বিক্রি করা যায় এমন জিনিস।
লোকশিল্প – দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরী শিল্পসম্মত দ্রব্য।
টেকসই – মজবুত।
বিশেষজ্ঞ – বিশেষ বিষয়ে যার জ্ঞান ও দক্ষতা রয়েছে।
অমূল্য – মূল্য দিয়ে যার বিচার করা যায় না।
নিবিড় – ঘনিষ্ঠ।
অপ্রতুল – যথেষ্ট নয়।
দক্ষতা – নিপুণতা, কুশলতা।
লুপ্তপ্রায় – যা লোপ পেতে বসেছে।
রেওয়াজ – রীতি, দস্তুর
অনুপ্রেরণা – উদ্দীপনা, উৎসাহ।
জীবনগাথা – জীবনের কাহিনী।
অপরিহার্য – যা এড়ানো যায় না, আবশ্যিক।
ঐতিহ্য – অতীতের গর্ব ও গৌরবের বস্তু।
প্রতীকধর্মী – নিদর্শনজ্ঞাপক, সংকেত।
সংরক্ষণ – বিশেষভাবে রক্ষা করা।
সম্প্রসারণ – প্রসারিত করা, বিস্তার করা।
টোপর – হিন্দু বরের মাথার মুকুট।
মণিপুরী – মণিপুর–সম্পর্কিত, মণিপুরে উৎপন্ন।

টীকা

ভৌগোলিক অবস্থান – পাহাড়, নদী, অরণ্য, সমতলভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি যে প্রাকৃতিক অঞ্চলে একটি দেশ গড়ে ওঠে। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সেদেশের মানুষের চালচলন, জীবিকা, শিল্প ও সাহিত্যের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

দেশের ঐতিহ্য ও জীবনের প্রতিনিধিত্ব – লোকশিল্পের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে কাপড়ের তৈরি পুতুল। বিভিন্ন দেশের লোকশিল্পীরা তাঁদের দেশের ছেলেমেয়ে, শ্রমিক, গাঁয়ের বধূ ইত্যাদি নানা নমুনার পুতুল তৈরি করে। ঐসব পুতুলের চেহারা পোশাক ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দেশের ঐতিহ্যেরই ছাপ শুধু পড়ে না, তাতে সেসব দেশের আচার–আচরণ, কাজকর্ম ও জীবনের নানা ছোটখাটো ঘটনাও রূপ পায়। এ কারণেই বলা হয় যে, লোকশিল্পের অন্তর্গত পুতুল একটি দেশের ঐতিহ্য ও সেদেশের মানুষের জীবনের পরিচিতি অপরের সামনে তুলে ধরার একটি সুন্দর মাধ্যম।

প্রতীকধর্মী পুতুল – ঘর সাজাবার জন্য কাপড় দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পুতুল তৈরি করা হয়। সেসব পুতুল সব সময়ই মানুষ, পাখি, পশু ইত্যাদির বাস্তব আকৃতির অনুকরণে তৈরি হয় তা নয়। ময়ূর, বাঘ, হরিণ বা কিষাণ–কিষাণী–যে কোনো পুতুলকেই শিল্পী তাঁর সূক্ষ্ম শিল্প–অনুভূতি ও সৌন্দর্যচেতনার মাধুর্য মিশিয়ে রূপ দিতে পারেন, যাতে ময়ূর বা বাঘ বা কিষাণ–কিষাণী অবিকল পশু–পাখি বা মানুষের প্রতিকৃতি না হয়ে বিশেষ ধরনের তাৎপর্যবাহী সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে। তখনই ঐ পুতুলকে প্রতীকধর্মী পুতুল বলা যায়। প্রতীকধর্মী পুতুল তৈরি করতে বিশেষ সৌন্দর্যবোধ এবং বিচার–বিবেচনার প্রয়োজন হয়।

স্বদেশী আন্দোলন– ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন।

পাঠ-পরিচিতি

'আমাদের লোকশিল্প' প্রবন্ধটি 'আমাদের লোককৃষ্টি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক–ঐতিহ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এ বর্ণনায় লোকশিল্পের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় রয়েছে। আমাদের নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসই এ কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্পগুণ বিচারে এ ধরনের শিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত লোকশিল্পের দ্রব্য তৈরি হত তার অনেকগুলোই অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। ঢাকাই মসলিন তার অন্যতম। ঢাকাই মসলিন অধুনা বিলুপ্ত হলেও ঢাকাই জামদানি শাড়ি অনেকাংশে সে স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে জামদানি শাড়ি দেশে–বিদেশে পরিচিত এবং আমাদের গর্বের বস্তু।

নকশি কাঁথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও এর কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে এক–একটি পরিবারের কাহিনী, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটি দিয়ে নানা প্রকার শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। নানা প্রকার পুতুল, মূর্তি ও আধুনিক রুচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত।

আমাদের দেশের এই যে লোকশিল্প—তার সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের লোকশিল্পের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্প ও লোক–ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে। তারা দেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আগ্রহী হবে এবং তা সংরক্ষণে তৎপর হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন নদীর জলীয়বাষ্প জামদানি শিল্পের জন্য উপযোগী?

ক. বুড়িগঙ্গা খ. শীতলক্ষ্যা
গ. গোমতী ঘ. মেঘনা

২. হাতে তৈরি সুতা থেকে কোন জাতীয় কাপড় তৈরি হয়?

ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. খদ্দর ঘ. তসর

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

কাঁসা ও পিতলের তৈরি শিল্পটির ব্যবহার বর্তমানে অনেকটাই কমে এসেছে। বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা, কলসি এসব তৈজসপত্র কাঁসা ও পিতলে তৈরি হয়। বর্তমানে ঘর সাজাবার কাজে পিতলের শৌখিন সামগ্রী বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

৩. ‘তৈজসপত্র’ শব্দটির অর্থ কী?

ক. বাসনকোসন
খ. শখের জিনিস
গ. সাজসজ্জার বস্তু
ঘ. শিল্প–সামগ্রী

৪. কাঁসা ও পিতলের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার বর্তমানে কোন শিল্পের প্রসারে লোপ পেয়েছে–

ক. কাঠ
খ. কাগজ
গ. প্লাস্টিক
ঘ. মৃৎ

৫. পিতলের শৌখিন সামগ্রী কোনগুলো?

ক. গ্লাস, বাটি, চামচ
খ. বদনা, জগ, মগ
গ. পুতুল, ফুলদানি, নকশিকাঁথা
ঘ. বালতি, ফুলের টব, হাঁড়ি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

মৃৎশিল্প বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। মৃৎশিল্পকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিনতে পারি, যেমন–গৃহস্থালির কাজে তৈজসপত্র, হাঁড়ি ও পাতিল, সানকি, পিঠার ছাঁচ ইত্যাদি; আধুনিক রুচির শৌখিন সামগ্রী ফুলদানি, ফুলের টব, বাক্স, কৌটা ইত্যাদি। সাজসজ্জার বস্তু, চুড়ি, মালা, দুল ইত্যাদি। আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মূর্তি এবং মন্দির, মসজিদের গায়ে টেরাকোটার কাজ। এগুলো সমস্তই লোকশিল্পের অতুলনীয় নির্দশন।

ক. মৃৎশিল্প কী?
খ. ‘মৃৎশিল্প বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন’ এ মন্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।
গ. তোমার পাঠ্যবইয়ে পোড়ামাটির কাজের নির্দশনসমূহ দেওয়া আছে তার সঙ্গে উদ্ধৃতির মিল ও অমিল খুঁজে বের কর।
ঘ. মৃৎশিল্পের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের বিস্তারিত পরিচয় দাও।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলাদেশের লোকশিল্পসমূহ দীর্ঘদিন ধরে এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু কারিগরি দক্ষতা নয়, এক ধরনের শিল্পীমন এই ঐতিহ্যটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য লোকশিল্পগুলোর মধ্যে আছে তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, কাঠের কাজ, কাঁসা ও পিতলের কাজ, পাটের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, এমনকি নকশি পিঠার কাজ।

ক. লোকশিল্প কাকে বলে?
খ. ‘কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে শিল্পীমনের সংযোগে এ শিল্প গড়ে উঠেছে’— ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে যে সকল শিল্পের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কোনটি কোন অঞ্চলকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং কেন—ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে লোকশিল্প কীভাবে জড়িয়ে আছে?—বিশ্লেষণ কর।



এক সময়ে আরবের অন্তঃপাতী ইয়েমেন প্রদেশে জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। বদান্যতার কারণে তিনি প্রসিদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। ধনদানে তিনি জলদস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার হস্ত বারিধারার ন্যায় দিরহাম বর্ষণ করিত। দান–মহিমায় ও সদানুষ্ঠানের গৌরব–গরিমায় তাঁহার তুলনা আছে বলিয়া তিনি জানিতেন না। এই নিমিত্ত তিনি হাতেমের নাম শুনিতে পারিতেন না। কেহ তাঁহার নিকট হাতেমের গুণকীর্তন করিলে তিনি ক্রোধে দিশেহারা হইয়া বলিতেন, 'আর কতদিন ধরিয়া সকলে সেই কপর্দকহীন হতভাগার কথা লইয়া এরূপ আলোচনা করিবে? তাহার রাজ্য নাই, ধন নাই, প্রভাব নাই— কিসের তাহার এত গৌরব? সামান্য সে লোক—কিসের তাহার এত মহিমা?'

কথিত আছে, এক দিন নরবর মহাসমারোহে এক দরবার আহ্বান করিলেন। রাজ্যের ধনীমানী জনসাধারণ তথায় আসিয়া সমবেত হইল। ভূপতি নানা প্রকারে তাহাদিগের আদর আপ্যায়ন ও সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন। সুস্বাদু রাজ–ভোগের গন্ধে সভা আমোদিত হইল, মর্যাদামতে 'এনাম' ও 'খেলাৎ' দিকে দিকে বিতরিত হইল, ধনভান্ডার হইতে অজস্রধারে ধন বর্ষিত হইল। ভূপতির মহিমায় লোকে মুগ্ধ হইল, —হর্ষে নৃপতির মন মাতিল। এমন সময় রাজমহিমা ম্লান করিয়া কেহ হাতেমের জয় ঘোষণা করিয়া উঠিল, সকলে হাতেমের প্রশংসা–ধ্বনিতে সভাতল মুখরিত করিয়া তুলিল। এক মুহূর্তে হতমান নৃপতির মুখ রোষে ও ক্ষোভে অন্ধকার হইয়া গেল; হিংসার কালানল তাঁহার হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। "হায়! হায়! এত করিয়াও সেই ঘৃণিত ভিখারির নাম ডুবাইতে পারিলাম না! রাজা হইয়া কড়ার কাঙ্গালকে পরাজিত করিতে পারিলাম না! যতদিন সে আছে, ততদিন আমার নাম নাই। যতদিন তার প্রাণ আছে, ততদিন আমার নাম নাই।" মানের দায়ে, নামের খাতিরে, রাজা পিশাচ সাজিলেন, হাতেমের নাম চিরতরে মিটাইয়া দিবার জন্য, তাহার শোণিতধারায় জ্বালাময় হৃদয় শীতল করিবার জন্য গুপ্তহন্তা প্রেরণ করিলেন।

ঘাতক তাই—কুলের বাসস্থানাভিমুখে হাতেম–সন্ধানে যাত্রা করিল। পথে একজন যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। আশ্চর্য সে যুবক—মোহিনী তাহার মূর্তি! সে সুন্দর, সুপুরুষ ও সুদর্শন। প্রাজ্ঞতার প্রভামণ্ডল তাহার বদন বেড়িয়া বিরাজিত রহিয়াছে। মমতার হাসি তাহার অধরযুগল হইতে মধুবর্ষণ করিতেছে। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিলে তাহার নীল নয়নে বান্ধবতা উজ্জ্বল রাগ ফুটিয়া ওঠে, সে কথা বলিলে তাহার মুখ হইতে অমৃত ক্ষরিয়া পড়ে। দেখিলেই বোধ হয়, কত দিনের যেন সে আত্মীয়, কত যুগের যেন সে সুহৃদ। হাসিয়া সে দুর্দান্ত দস্যুর মন হরণ করিল, আপন

জনের মতো হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। যুবক অশেষ প্রকারে পরিচর্যা করিয়া শ্রান্ত পান্থকে শান্ত করিল, সহানুভূতির স্বরে তাহার প্রাণ প্রফুল্ল করিয়া তুলিল এবং বিনয় করিয়া স্বীয় সেবার অজস্র ত্রুটির কথা জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। এই অনন্যসুলভ অযাচিত অমিয়-মধুর ব্যবহারে হন্তার প্রাণ গলিয়া গেল, প্রেমে সে যুবকের দাস হইয়া পড়িল। প্রভাত হইলে যুবক অতিথির হস্ত ও পদচুম্বন করিয়া নিবেদন করিল, 'হে বন্ধো! পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, দীর্ঘপথ ভ্রমণে তোমার চরণ অসাড় হইয়াছে, কিছুদিন আমার গৃহে থাকিয়া শ্রান্তি দূর কর।'

ঘাতক উত্তর করিল, 'না, তাহা অসম্ভব। এখানে আর বিলম্ব করিতে আমি অক্ষম। কারণ এক অতি জরুরি কার্য সম্পাদনের ভার আমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।'

সবিনয়ে যুবক বলিল, 'কি সে কাজ, আমি কি তাহা জানিতে পারি না? কৃপা করিয়া আমাকে তাহা জানিতে দাও, অভিন্নহৃদয় সুহৃদের ন্যায় প্রাণ দিয়াও আমি সে কার্যে তোমার সহায়তা করিব।'

যুবকের আন্তরিক বান্ধবতায় হন্তা মুগ্ধ; সে আর তাহার নিকট অপরিচিত পর নহে, পরম আত্মীয়। সাধ্য কি তাহার নিকট প্রাণের কথা গোপন করে? সে স্মিত মুখে বলিল, 'এ আর এমন কি বেশি কথা? তুমি যেরূপ সজ্জন ও মহাজন, তাহাতে তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিতে আর ভয় কি? আমি জানি, মহানুভব পুরুষে কখনও কাহারও গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে না। তুমি বোধ হয় জান, এই প্রদেশে হাতেম নামে এক জন খ্যাতনামা মহাচরিত সাধুপুরুষ বাস করেন। কি কারণে জানি না, তাঁহার ওপর ইয়েমেনাধিপতির বড়ই আক্রোশ জন্মিয়াছে। হাতেমের ছিন্নশির না দেখিলে তিনি আর স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। রোষশান্তির জন্য আমাকে হাতেম-হননে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাই হাতেমের শির সন্ধানে আমি যাত্রা করিয়াছি। অতএব, হাতেম কোথায় থাকে তাহা যদি আমাকে দেখাইয়া দাও তাহা হইলে বড়ই উপকার ও বন্ধুর কাজ করা হয়, তরবারির এক ঘায়ে আমি হাতেম-মুণ্ড ছিন্ন করিয়া লই।'

এই কথার পরে যাহা ঘটিল, তাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত, বিস্ময়ের বিস্ময়। পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীতে শত শত আলোকমালা-বিভূষিত অপ্সরা কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত-লহরী-পরিপ্লাবিত রাজপ্রাসাদে আনন্দোৎসবের অবিরাম কলধ্বনির মধ্যে সহসা বজ্রপতন হইলে মানব-মন অধিকতর স্তম্ভিত হয় না। দিক্‌দিগন্ত-বিলোপকারী, তারকা-ভাতিহীন নিবিড় তমোময় অমানিশায় সুধাংশু উদিত হইলে মানুষ অধিকতর হতবুদ্ধি হয় না। হাতেম-রক্ত-পিপাসী কৃপাণ-পাণি হন্তাকে বিস্ময়-সাগরে ডুবাইয়া দিয়া, মধুর হাসি হাসিয়া, মাথা নোয়াইয়া যুবক বলিল, 'আমিই হাতেম, হে বন্ধু, তোমার সকল কষ্টের আমিই কারণ। মুক্ত তরবারির আঘাতে এখন এ দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া লও, তোমার সকল পরিশ্রম সার্থক হউক। তোমার প্রীত্যার্থে, নৃপতির সুখের নিমিত্ত, মানুষের আনন্দের জন্য এ ছার জীবনদান করিব, এ তুচ্ছ শির ধুলায় লুটাইব, ইহা এমন কি কাজ। লও, লও শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক, শীঘ্র তোমার কর্ম সমাধা করিয়া লও। এখনও রজনীর অন্ধকার সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই, এখনও পুরবাসী লোকজন জাগরিত হয় নাই, কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না, কেহ বাধা দিবে না, এ-ই সুযোগ, পিপাসা মিটাও, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। আলোকের সঙ্গো সঙ্গো নৈরাশ্য আসিতে পারে— সময় থাকিতে এ শির ধুলায় লুটাও।'

অবনত-শির মহাবীর হাতেমের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদিয়া মহত্ত্বের যে মহাশক্তি নিঃসৃত হইল, তাহার আঘাতে ঘাতকের তীক্ষ্ণ তরবারি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। পাষাণ হৃদয় ভাঙিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, তাহার মধ্য হইতে নিশ্চল নয়ন ভেদিয়া মানব-হিয়া গোমুখী ধারায় গলিয়া পড়িল। প্রেমের জয় হইল, বহু দিবসের সুপ্ত আত্মা সাড়া দিল, ভিতরের মানুষ কথা বলিল। কাঁদিয়া তূণীর ও তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘাতক হাতেমের পদতলে ধূলিরাশির মধ্যে লুটাইয়া পড়িল, —বিহ্বল হইয়া হাতেমের হস্ত ও পদ চুম্বন করিতে লাগিল। তারপর চিরকৃতার্থ দাসের মতো বুকে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গদ্গদ্ভাবে সে বলিল, 'মহান! তোমার জীবন অক্ষয় হইক। তোমার অঙ্গাস্পর্শে এ অধম দাস ধন্য হইয়াছে, এই বলিয়া সসম্মানে হাতেমের দুই নয়নে চুম্বন প্রদান করিয়া সে স্থান হইতে ঘাতক, ইয়েমেনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সে রাজসকাশে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দেখিয়াই নৃপতি বুঝিতে পারিলেন, হাতেম-হননে কৃতকার্য হয় নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কি সংবাদ? তোমাকে ওরূপ ম্লান দেখাইতেছে কেন? তোমার অশ্ব-জিনে হাতেমের মস্তক বাঁধা দেখিতেছি না কেন? তুমি কি সফলকাম হও নাই? বুঝি বা হাতেম পূর্বাহ্ণেই তোমাকে আক্রমণ করিয়া দুর্বল ও অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছিল।'

সংবাদবাহক ভূমিতল চুম্বন করিয়া নৃপতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিল এবং তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়া নিবেদন করিল, 'হে ন্যায়বান ও জ্ঞানবান ভূপাল! হে জাঁহাপনা! আজ হইতে হাতেমের প্রশংসা শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইতে ক্ষান্ত হউন। কারণ, আপনার রোষ-স্থল সেই প্রসিদ্ধনামা হাতেমকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তিনি এক জন সুকৌশলী ও প্রিয়দর্শন সুপুরুষ। দেখিলাম তাঁহার মহত্ত্বের অন্ত নাই, জ্ঞানের সীমা নাই, সদাশয়তার অবধি নাই। অনুগ্রহের ভারে তিনি আমার পৃষ্ঠ কুব্জ করিয়া দিয়াছেন এবং কৃপা ও করুণার তরবারি দ্বারা আমাকে বধ করিয়াছেন।'

তারপর সে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হাতেমের অলোক-সাধারণ মহানুভবতা ও মহত্ত্বের কথা বিবৃত করিল।

সে বিস্ময়াবহ কাহিনী শুনিয়া নৃপতি মুগ্ধ হইলেন। বহুদিনের বিদ্বেষভাব দূরে গেল, ভক্তিতে অন্তর আর্দ্র হইল। প্রেমের জয় হইল। হাতেম-প্রশংসা-রুষ্ট নৃপতি হাতেমের জয়গানে শতকণ্ঠ হইলেন, তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া স্বতঃই উত্থিত হইল, 'ধন্য হাতেম! ধন্য তাঁহার কুল! হাতেম ও করুণা একই জিনিস! তাঁহার যশঃধ্বনি তাঁহার মহত্ত্ব-মহিমারই অনুরূপ।'

লেখক-পরিচিতি

ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার মাগুড়াডাঙ্গা গ্রামে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্ম হয়। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করেন। তিনি যখন বি.এ. ক্লাসে পড়ছিলেন তখন তাঁর সম্পাদনায় 'কোহিনূর' পত্রিকা বের হয়। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার কাজে এ পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তিনি চট্টগ্রাম, রাজবাড়ি ও পাংশার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। শেষজীবনে তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। গভীর ভাব-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাস থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি তাঁর প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ : ধর্মের কাহিনী, শান্তিধারা, মানব মুকুট, নূরনবী প্রভৃতি। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

অন্তঃপাতী – অন্তর্গত।
প্রখ্যাতনামা – খ্যাতিমান, বিখ্যাত।
বদান্যতা – দানশীলতা।
জলদ – মেঘ।
নরবর – মানুষের মধ্যে প্রধান।
আপ্যায়ন – সংবর্ধনা, আদর, যত্ন।
ঘাতক – হত্যাকারী, হন্তা।
হন্তা – হত্যাকারী।
আক্রোশ – ক্রোধ, রাগ।
সংবর্ধনা – অভ্যর্থনা।
প্রাজ্ঞ – জ্ঞানী, অভিজ্ঞ।
এনাম – পুরস্কার, বখশিশ।
সুহৃদ – সুন্দর হৃদয় যার, বন্ধু।
কালানল – ধ্বংসের আগুন।
হতমান – অপমানিত।
দিরহাম – আরবীয় মুদ্রা।
ঘৃণিত – ঘৃণাপ্রাপ্ত, ঘৃণার যোগ্য।
গুণকীর্তন – প্রশংসা করা।
প্রাজ্ঞতা – পাণ্ডিত্য।
কপর্দকহীন – নিঃস্ব।
অযাচিত – না চাইতেই।
ভূপতি – রাজা, বাদশাহ।
খেলাৎ – উপহার।
অধরযুগল – ঠোঁট দুটি।
অসাড় – যাতে সাড়া নেই, নিস্তেজ, ক্লান্ত।
পান্থ – পথিক।
ব্রহ্মারন্ধ্র – মস্তিকের মধ্যভাগের সন্ধিস্থান বিশেষ।
তমোময় – অন্ধকারাচ্ছন্ন।
অভিন্নহৃদয় – একমন, বন্ধু।
কুব্জ – বাঁকানো।
কুল – বংশ।
কৃপাণপাণি হন্তা – তরবারি হাতে ঘাতক।

রুষ্ট	–	রাগান্বিত, ক্ষুব্ধ।	**তূণীর**	–	তীর রাখার আধার।
কৃতকার্য	–	সফল।	**অপ্সরা**	–	স্বর্গের নর্তকী।
বিদ্বেষ	–	ঈর্ষা, হিংসা।	**কণ্ঠোত্থিত**	–	গলা থেকে বের হওয়া।
স্বতঃই	–	আপনা–আপনি।	**অমানিশা**	–	অমাবস্যার রাত।
			সুধাংশু	–	চাঁদ।

টীকা

মমতার হাসি – যে হাসিতে মমতার প্রকাশ ঘটে। এখানে যুবক হাতেমের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও মধুর হাসির কথা বলা হয়েছে। ইয়েমেনের রাজা ঘাতককে পাঠিয়েছিলেন হাতেমকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথিমধ্যে অচেনা যুবক হাতেমের সঙ্গে ঘাতকের দেখা হয়ে যায়। যুবকের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হয় ঘাতক।

প্রিয়দর্শন সুপুরুষ – দেখতে ভালো লাগে এমন ব্যক্তি। এখানে হাতেমের কথা বলা হয়েছে। হাতেম দেখতেই কেবল সুদর্শন ছিলেন না, তাঁর হৃদয়ও ছিল অত্যন্ত উদার ও মহৎ।

গোমুখী ধারা – হিমালয়ে গোমুখাকৃতি গহ্বর যার মধ্যে দিয়ে গঙ্গানদী প্রবহমান তাকে গোমুখী বলে। গোমুখী ধারা বলতে গঙ্গা নদীর প্রবাহের কথা বলা হয়েছে।

পাঠ-পরিচিতি

'মহত্ত্বের শক্তি' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'ধর্মের কথা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ প্রবন্ধে মহৎ–হৃদয় হাতেম তায়ীর বদান্যতার একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ইয়েমেনের নরপতি বদান্যতার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেয়ে বেশি খ্যাতি পেয়েছিলেন হাতেম তায়ী। নরপতি এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য এক জন গুপ্তঘাতক নিয়োজিত করেন। ঘাতকটি হাতেম তায়ীর খোঁজ নেওয়ার জন্য গেলে হাতেম তায়ী তাকে নিজগৃহে পরম আদরে স্থান দেন। ঘাতক প্রথমে হাতেম তায়ীকে চিনতে পারেনি। হাতেম তায়ী ঘাতকের আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। ঘাতক জানাল যে, সে হাতেম তায়ীকে হত্যা করার জন্য খুঁজছে। তাঁকে হত্যা করলে বড় রকমের পুরস্কার পাবে। হাতেম তায়ী নিজের পরিচয় দিলেন এবং তাঁর মাথা কেটে নিয়ে পুরস্কার গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। ঘাতক হাতেমের এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং ফিরে গিয়ে নরপতিকে এই মহত্ত্বের কথা জানাল। নরপতি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং হাতেমের মহত্ত্বের কাছে মাথা নত করলেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কাহিনী পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা বিষয়ে সচেতনতার অধিকারী হবে। তারা হাতেম তায়ীর মহানুভবতার কথা জানবে এবং সে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'মহত্ত্বের শক্তি' প্রবন্ধটি মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. ধর্মের কথা খ. শান্তি ধারা
গ. মানব মুকুট ঘ. নুর নবী

২. হাতেমের হস্ত ও পদ চুম্বন করতে লাগল কে?

ক. নরপতি খ. ঘাতক

গ. পথিক ঘ. সাধুপুরুষ

৩. 'এক মুহূর্তে হতমান নৃপতির মুখ রোষে ও ক্ষোভে অন্ধকার হইয়া গেল'—চরণটি কোন ভাষারীতিতে লেখা হয়েছে—

ক. উপভাষা খ. চলিতভাষা

গ. সাধুভাষা ঘ. আঞ্চলিক ভাষা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

"হে ন্যায়বান ও জ্ঞানবান ভূপাল; হে জাঁহাপনা! আজ হইতে হাতেমের প্রশংসা শ্রবণে রোষাবিষ্ট হইতে ক্ষান্ত হউন। কারণ, আপনার রোষাস্থল সেই প্রসিদ্ধনামা হাতেমকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তিনি একজন সুকৌশলী ও প্রিয়দর্শন সুপুরুষ। দেখিলাম তাহার মহত্ত্বের অন্ত নাই, জ্ঞানের সীমা নাই, সদাশয়তার অভাব নাই। অনুগ্রহের ভারে তিনি আমার পৃষ্ঠ কুব্জ করিয়া দিয়াছেন এবং কৃপা ও করুণার তরবারি দ্বারা আমাকে বধ করিয়াছেন।"

ক. ন্যায়বান ও জ্ঞানবান ভূপাল বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

খ. "তিনি একজন প্রিয়দর্শন সুপুরুষ"—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ধৃতিতে একজন মহৎ লোকের কী কী পরিচয় আছে— উপস্থাপন কর।

ঘ. 'কৃপা ও করুণার তরবারি দ্বারা আমাকে বধ করিয়াছেন'—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

হাতেমতায়ী ছিলেন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি এত বেশি খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে ইয়েমেনের নরপতিকেও হার মানিয়েছিলেন। নরপতি এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে হাতেমতায়ীকে হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠালেন। ঘাতক হাতেমতায়ীর গৃহে পরম আদরে স্থান পায়। হাতেমতায়ী ঘাতকের কাছ থেকে তার আগমনের হেতু জানতে পেরে নিজ পরিচয় দিয়ে তাঁর মাথা কেটে নিয়ে পুরস্কার গ্রহণের অনুরোধ জানান। ঘাতক হাতেমের এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফিরে গিয়ে নরপতিকে এই মহত্ত্বের কথা জানালে নরপতি নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

ক. হাতেমতায়ীকে হত্যা করার জন্য কে ঘাতক পাঠালেন?

খ. নরপতি হাতেমতায়ীকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কেন?—ব্যাখ্যা কর।

গ. হাতেমতায়ী ও ইয়েমেনের নরপতির চরিত্রের পার্থক্য কোথায় লেখ।

ঘ. ঘাতক হাতেমতায়ীকে হাতের কাছে পেয়েও হত্যা করল না কেন? বিচার বিশ্লেষণ কর।

সুন্দর ব্যবহার

রাজিয়া মাহবুব



এক জন মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা তা বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। সে ভদ্র কি অভদ্র তাও বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে।

ব্যবহার ভালো হলে লোকে তাকে ভালো বলে। তাকে পছন্দ করে। ব্যবহার খারাপ হলে লোকে তাকে খারাপ বলে। তাকে অপছন্দ করে। তার সঙ্গে মিশতে চায় না। তার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তাকে কাছে ডাকতে চায় না। তোমার ব্যবহার দিয়েই তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

ব্যবহার বলতে আমরা কী বুঝি? এক জনের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব–কায়দা। যার কথা বলার ধরন সুন্দর, সে হাসিমুখে ভালোভাবে কথা বলে, আমরা তার বেলাতে বলি, এর ব্যবহার ভালো।

অতএব তোমরা যখন কথা বলবে বা কারও কথার উত্তর দেবে তখন হাসিমুখে সুন্দর করে কথা বলবে। কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ করবে না। যদি কাজের সময় হয়, যদি তুমি ব্যস্ত থাকো তাহলে তা খুলে বলবে।

তোমার ভাই বোন বন্ধু বা অপর যে–কেউই হোক না কেন তার সুবিধা অসুবিধার কথা বুঝতে চেষ্টা করবে, তা হলে লোকের সঙ্গে তোমার ব্যবহার ভালো হবে।

তা হলে তুমি অল্পেতে কারও ওপর রাগ করতে পারবে না। তা হলে তুমি কাউকে ভুল বুঝবে না। কারও ওপর অকারণে অভিমান হবে না। তা হলে তুমি অপরের দোষ ক্ষমা করতে পারবে। ব্যবহার ভালো করতে হলে অপরের দোষ ক্ষমা করতে হয়, অপরের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবতে হয়। অপরের যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা ভাবতে হয়। তা হলে তুমি সহজেই অপরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে পারবে। ব্যবহার ভালো করতে হলে ভদ্রতা শিখতে হয়। ভদ্রতা মেনে চলতে হয়।

আমরা সভ্য জগতের মানুষ। সভ্য জগতে ভদ্রতা মেনে চলতে হয়। ভদ্রতা মেনে না চললে লোকে তাকে অভদ্র বলে, অসভ্য বলে।

ভদ্রতা না জানলে, না মেনে চললে ব্যবহার ভালো হতে পারে না। ব্যবহার ভালো না হলে কারও কাছে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় না। ভালোবাসা পাওয়া দুর্লভ হয়।

তুমি যদি ভদ্রতা না জান বা না মেনে চল, তাহলে তোমার অতি আপনজনেরাও তোমাকে এড়িয়ে চলবে, খারাপ বলবে, মনে কষ্ট পাবে। তোমার চেয়ে যারা বয়সে ছোট তারা কষ্ট পাবে। ভাববে, তুমি তাদের ছোট ভাবছ। তোমাকে অহংকারী ভাববে। তোমার চেয়ে যাঁরা বড়, তাঁরা মনে কষ্ট পাবেন। ভাববেন, তোমার ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা

নেই। তাঁরা যে তোমার চেয়ে বয়সে, বুদ্ধিতে বড়, প্রবীণ একথা স্বীকার করতে চাইছ না। তাঁরা দুঃখ পাবেন। কারও মনে দুঃখ দেওয়াটা ভালো ব্যবহার নয়। অতএব ভদ্রতা মেনে চলো।

ভদ্রতা মানতে হলে ভদ্রতা কী তা জানতে হয়। ভদ্রতার প্রথম সোপান হচ্ছে বিনয়। তুমি বিনীত হও। তুমি নম্র হও। তাতে তুমি ছোট হবে না। তাতে কেউ তোমাকে ছোট ভাববে না।

বিনীত হওয়া, নম্র হওয়া মানে এ নয় যে, তোমাকে হুজুর হুজুর করতে হবে। অথবা জোড়হাতে থাকতে হবে। তোমার দাঁড়াবার, বসবার, কথা বলবার, তাকাবার ভঙ্গিটি যেন উদ্ধত না হয়। ভদ্রতার, আদব–কায়দার সাধারণ নিয়মগুলো মানতে যেন বিরক্তির ভঙ্গিটি ফুটে না ওঠে।

বিভিন্ন দেশে ভদ্রতার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। সব দেশের এটিকেট এক নয়। তবু মূল কথাটি এক। মূল সুরটি এক। যেমন ধরো, পরিচিত জনকে দেখলে হাসিমুখে অভিবাদন করা, কুশল জিজ্ঞেস করা বা কেমন আছেন তা জানতে চাওয়া, তাঁর কথার উত্তর দেওয়া, এটা সব দেশের রীতি।

অপরিচিত লোকও যদি রাস্তার নাম বা কোনো বিশেষ বাড়ি বা ব্যক্তির সন্ধান করেন বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কথা জানতে চান তবে সঠিক সন্ধান দেবে।

কারও কথার উত্তর না দেওয়া অভদ্রতা। উত্তর তোমার জানা না থাকলে তুমি জান না অন্তত এটুকু বলবে। দেখে চিনতে না পারার ভান করা বা পরিচিত জনের সঙ্গে কথা না বলা অভদ্রতা। অপরিচিত জনেরও কথার উত্তর না দেওয়া অভদ্রতা। তেমনি অবান্তর প্রশ্ন করা অভদ্রতা। অকারণে ঝট করে কারও বয়স, বেতন, পড়াশুনা ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করাটা অনুচিত।

অনুমতি না নিয়ে কারও ঘরে বিশেষ করে শোবার ঘরে, রান্নাঘরে ঢুকবে না। এটা খুবই অশোভনীয়। কারও কাজের সময় তার কাছে গিয়ে গল্প করে তার সময় নষ্ট করবে না। কাউকে তার দুর্বলতা নিয়ে ঠাট্টা করা বা লজ্জা দেওয়াটা রীতিমতো অভদ্রতা।

তুমি যদি তার সত্যিকার বন্ধু হও বা তার ভালো চাও তাহলে ঠাট্টা–বিদ্রূপ না করে, যাতে তার ভালো হবে, তেমন উপদেশ তুমি দিতে পার। অবশ্য তার আগে তোমাকে ভাবতে হবে তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন। সে তোমার কথায় দুঃখ পাবে কি না, সেকথা আগে ভাবতে হবে।

কাউকে পড়ে যেতে দেখলে বা ব্যথা পেতে দেখলে হাসবে না। তোমার ক্লাসে কেউ পড়া না পারলে বা ভুল উত্তর দিলে হাসবে না।

তোমার সুবিধার জন্য অন্য কারও অসুবিধা না ঘটে সে বিষয়ে সাবধান হবে। কারও খাবার সময় সে না ডাকলে তার সামনে বসে থাকবে না। তাতে সে লজ্জা পেতে পারে।

তোমার বাড়িতে মেহমান এলে তুমি তার আরামের সুবিধার ব্যবস্থা করতে পেছপা হবে না। তোমার সাধ্য অনুযায়ী তার যত্ন করবে। কেউ বাড়িতে এসে তোমাকে না পেলে বাড়ি ফিরে তুমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

কাউকে কথা দেবার আগে ভালো করে ভেবে নেবে। কথা দিয়ে তা রাখতে চেষ্টা করবে। রাখতে না পারলে আগে থেকে জানিয়ে দেবে। তা না হলে যাকে কথা দিয়েছ তার অনেক রকম অসুবিধা হতে পারে। মানী ব্যক্তিকে সম্মান করবে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবে না। তাহলে যার কাছ থেকে উপকার পেয়েছ তার প্রতি তোমার ব্যবহার আপনা থেকেই সহজ সুন্দর হবে।

যিনি তোমাকে এক দিন একটি অক্ষরও পড়িয়েছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন তিনিই তোমার শিক্ষক। যেমন তোমার বাবা মায়ের প্রতি, তেমনি শিক্ষকের প্রতি আজীবন তুমি বিনীত নম্র হয়ে কথা বলবে। তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেবে। ভবিষ্যতে তুমি যদি তোমার শিক্ষকের চেয়ে উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হও, তবু তাঁকে সম্মান করবে।

গুণী ব্যক্তি যদি দরিদ্র হন তবু গুণ দিয়ে বা বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তিনি সমাজের উপকার করেন। অতএব তিনি তোমার কোনো উপকারে না আসলেও যাতে তাঁর গুণের বিকাশ হয় সেই চেষ্টা করবে। গুণীর গুণের কদর করবে। তোমার বন্ধু বা 'সহপাঠী যদি পড়াশুনা বা অন্য কোনো কাজ তোমার চেয়ে ভালো পারে তাহলে তাতে তুমি অসুখী হবে না

বরং আনন্দিত হবে। কারণ সে তোমার বন্ধু, তোমাদেরই এক জন। তার জন্য তোমার নিজেরও গর্ববোধ করা উচিত। তবে, তার ব্যবহার যদি ভালো না হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। তবু তুমি তার সঙ্গেও ভদ্র হতে চেষ্টা করবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Courtesy begets courtesy–ভদ্র ব্যবহার পেতে হলে ভদ্র ব্যবহার করতে হয়। রাগ হলেও তুমি উত্তেজিত হবে না। চেঁচামেচি করবে না, নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে। হিংসে হলেও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করবে না। বরং বিজয়ী বন্ধুকে প্রশংসা করবে।

ভালো ব্যবহারের জন্য টাকা–পয়সা লাগে না। যা লাগে তা হচ্ছে মনের উদারতা, ভদ্রতা ও সংযম। মনের উদারতা না থাকলে শুধু মুখের মিষ্টি হাসি বা কথা দিয়ে বেশি লোকের মন জয় করা যায় না। বেশি দিন কাউকে মুগ্ধ করে রাখা যায় না।

তবু দুটো ভালো কথা, একটু মিষ্টি হাসির প্রয়োজন আছে। তাতেও লোকের উপকার হয়। তোমার নিজের মন মেজাজও তাতে প্রফুল্ল থাকবে।

অতএব, পরের এতটুকু উপকার, নিজের এটুকু কল্যাণসাধন করতে কেন পেছপা হবে?

এখন থেকে তোমার ব্যবহারকে, তোমার ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করো। কাজটা খুব কঠিন নয়; শুধু অভ্যাসের প্রয়োজন; শুধু তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা।

লেখক-পরিচিতি

রাজিয়া মাহবুব ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি বর্ধমান ছেড়ে মাদারীপুর জেলার ভান্ডারীকান্দি গ্রামে চলে আসেন। শিক্ষকতাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই শিশুদের জন্য একটি কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘকাল তিনি সেই কিন্ডারগার্টেনের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিশু–কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আলাপচারিতার ভঙ্গি তাঁর রচনার প্রধান আকর্ষণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বন্ধন, খাপছাড়া, সাগরকন্যা, আপনি ও আপনার সন্তান ইত্যাদি। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

শব্দার্থ

দুর্লভ – যা সহজে লাভ করা যায় না।
মানী – যিনি সম্মান পেয়ে থাকেন।
কৃতজ্ঞতা – উপকারীর উপকার স্বীকার করা।
মনুষ্যত্ব – মানুষ হিসেবে গুণাবলির পরিচয়।
সোপান – সিঁড়ি, ধাপ।
উদ্ধত – দুর্দান্ত, গোঁয়ার, দুর্বিনীত।
অধিষ্ঠিত – অবস্থিত, অধিকৃত।
কুৎসিত – কদাকার, দেখতে খারাপ।
প্রতিদ্বন্দ্বী – বিপক্ষ, প্রতিযোগী।
এটিকেট – (Etiquette) মার্জিত আচরণ, শালীন ব্যবহার
অভিবাদন – সম্মান প্রদর্শন, সালাম, আদাব।
অবান্তর – অপ্রাসঙ্গিক, বাজে।
Courtesy - ভদ্রতা, সৌজন্য।

টীকা

Courtesy begets courtesy ভদ্র ব্যবহার পেতে হলে ভদ্র ব্যবহার করতে হয়। অন্যের প্রতি আমার ব্যবহার ভালো হলে তিনিও আমার প্রতি ভালো ব্যবহার করবেন। অপরকে যদি ভালোবাসি, কাছে টেনে নিই, তবে তিনি আমাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নেবেন।

শুধু তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা–ভালো ব্যবহার আসলে একটি ইচ্ছার ব্যাপার। আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে ভালো ব্যবহার করা কোনো কষ্টেরই ব্যাপার নয়। কাজেই ভালো ব্যবহার করতে হলে আগে মনকে তৈরি করে নিতে হবে।

পাঠ-পরিচিতি

সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত। মানুষের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব–কায়দার মধ্য দিয়েই সুন্দর ব্যবহারের প্রকাশ ঘটে। ভালো ব্যবহার দিয়ে সহজেই অপরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। মনের উদারতা, ভদ্রতা ও সংযম মানুষকে সুন্দর ও শোভন করে। ভদ্রতা ও নম্রতা মানে ছোট হওয়া নয়, বরং তা বড় হওয়ারই প্রথম সোপান।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী সুন্দর ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব–কায়দা এক জন মানুষকে সুন্দর মানুষ করে গড়ে তোলে– শিক্ষার্থীর আচরণে এ সত্যের প্রতিফলন ঘটবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. সুন্দর ব্যবহার একটি–

ক. গল্প খ. প্রবন্ধ
গ. ছোটগল্প ঘ. আত্মকাহিনী

২. নিজেকে অন্যের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় কিসের মাধ্যমে?

ক. কাজের খ. ভদ্রতার
গ. বিদ্যা–বুদ্ধির ঘ. চাতুর্যের আচরণের

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভালো ব্যবহারের জন্য টাকা–পয়সা লাগে না। লাগে মনের উদারতা, ভদ্রতা ও সংযম। মনের উদারতা না থাকলে শুধু মুখের মিষ্টি হাসি বা কথা দিয়ে বেশি লোকের মন জয় করা যায় না, বেশি দিন কাউকে মুগ্ধ করে রাখা যায় না।

৩. উদ্ধৃতাংশের লেখক–

ক. ডা. মুহাম্মদ লুৎফর রহমান খ. রাজিয়া মাহবুব
গ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঘ. বেগম রোকেয়া

৪. বাড়ির দরজায় দাঁড়ানো আগন্তুকের সম্মুখে ঠাস করে দরজা বন্ধ করা কোন ধরনের আচরণ?

i. নিষ্ঠুর
ii. অভদ্র
iii. অসৌজন্যমূলক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

৫. তুমি কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়িয়ে এলে। নিজ বাড়িতে এসে তোমার বন্ধুর বাড়ির কোন দিকটি বেশি মনে পড়বে?

ক. ঐ পরিবারের আচার–আচরণ　　খ. চাকচিক্যময় ঘর–গৃহস্থালি
গ. অভিজাত আসবাবপত্র　　ঘ. রুচিশীল খাবারদাবার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

অফিসের পিয়ন জাহাঙ্গীর বেশ বেয়াড়া, কাউকে পরোয়া করে না। এমনকি বড় স্যারকেও না। অফিসের সকলেই তার প্রতি বিরক্ত, সকলে তাকে এড়িয়ে চলে। তার অফিসের নতুন স্যার ফারুক সাহেব জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সদাচরণ করেন। তিনি তাঁর ব্যবহার দিয়ে জাহাঙ্গীরের ব্যবহারের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেন। ধীরে ধীরে জাহাঙ্গীরের আচরণে পরিবর্তন আসে। এখন সে আর কারও সঙ্গে খারাপ আচরণ করে না।

ক. অনুচ্ছেদটিতে মানুষের কোন বৈশিষ্ট্যটির কথা বলা হয়েছে?

খ. জাহাঙ্গীরকে কেন সকলেই এড়িয়ে চলে–বর্ণনা কর।

গ. মানুষের আচরণ পরিচালিত করার সহজ উপায় উদ্ধৃতাংশের আলোকে উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে শালীন ও ভদ্র আচরণের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. **উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

এক বিধর্মী বুড়ি নবী করিম (স)–কে নানাভাবে কষ্ট দিত। তাঁর প্রতি নানারূপ কটূক্তি করত–তাঁর পথে কাঁটা ফেলে রাখত–ঐ কাঁটা নবী (স)–র পায়ে ফুটলে বুড়ি খিলখিল করে হাসত। ঐ বুড়ির অসুখের সময় রসুল (স) তাকে সেবা শুশ্রূষা করে এবং চিকিৎসা ও পথ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। নবী করিম (স)–র এ আচরণে বুড়ি মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

ক. বুড়ি কীভাবে অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করে?

খ. বুড়ি কেন রসুল (স)–কে কষ্ট দিত–বর্ণনা কর।

গ. পরশ্রীকাতর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতিবেশীকে কীভাবে পরের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে গড়ে তোলা যায়–উদ্ধৃতাংশের আলোকে উপস্থাপন কর।

ঘ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে হযরত মুহম্মদ (স)–এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।



রাজা

এস. ওয়াজেদ আলি

তখন আমি ছেলেমানুষ, বয়স সাত বৎসর। হঠাৎ পায়রা পোষবার শখ মাথায় চাপল। কাঠের বাক্সের একটি খোপ বানিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলুম, আর তিন–চার জোড়া পায়রা এনে সেখানে বসিয়ে দিলুম।

তাদের আদরযত্নের অন্ত রইল না। এই পায়রার নেশা যখন উগ্রভাবে মাথায় বর্তমান, সেই সময়ে এক দিন নানীজানের এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। তাঁদের অনেক পায়রা ছিল। সেগুলি খেলছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখতে লাগলুম। তাদের মধ্যে একটি কপোত আমার মনকে দখল করে বসল। তার গায়ের রং ছিল স্লেট পাথরের মতো ধূসর। গলায় নীল রঙের পালকগুলি সূর্যের আলোয় চকমক করছিল। সে তার মাথায় উঁচু টোপরটি সগর্বে নেড়ে, "বাক বাকুম" "বাক বাকুম" করতে করতে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছিল, আর অন্য কপোত কপোতীরা সম্ভ্রমে তার জন্য পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। তার আকার ছিল অন্য পায়রার তুলনায় অনেক বড়। আমি স্বভাবতই তাকে দলের নেতা বলে মনে করলুম। "রাজা" বলে ডাকতে ডাকতে তার কাছে গেলুম। সে আমাকে দেখে পালাবার চেষ্টা করল না, আগের মতোই সগর্বে "বাক বাকুম" করে বেড়াতে লাগল।

রাজাকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করবার এক দুর্নিবার লোভ আমার মনকে পেয়ে বসল। ছেলেবেলার আগ্রহ কোনো বাধা–বিপত্তি মানে না। আমি তৎক্ষণাৎ নানীজানের কাছে গিয়ে আবদার ধরে বসলুম। পরের জিনিসে লোভ করতে নেই, এই নীতিকথা তিনি অনেক করে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমি কিন্তু বোঝবার ছেলেই ছিলাম না। আমাদের আত্মীয়েরা আমার আবদারের কারণ জানতে পেরে বললেন, "তা নিয়ে যাও বাবা। তোমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন আর কী করা যায়। ও পায়রাটি আর ওর জুড়িকে তোমায় বকশিশ দিলুম।" নানীজানের আপত্তি সত্ত্বেও আমি তখন "রাজা" আর "রানী"কে নিয়ে সগর্বে বাড়ি এলুম। তা ছাড়া তারা যাতে তাদের পুরানো আবাসে ফিরে যেতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে কাঁচি দিয়ে তাদের পালক কেটে দিলুম।

রাজা যেমন তার পুরানো রাজ্যে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করত আমাদের বাড়িতে আমার পায়রাগুলির মধ্যেও ঠিক সেইরূপ স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করতে লাগল। তার এই নতুন আবাসে তাকে দেখলে মনে হত রাজা হবার জন্যই সে জন্মেছে; আর তার সমসাময়িকদের পক্ষে তার প্রাধান্য স্বীকার করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

রাজার বেশভূষার একটি বিশেষত্ব থাকা দরকার মনে করে একদিন একটি নূপুর কিনে তার পায়ে পরিয়ে দিলুম।

রাজার পায়ের সেই নূপুরের ধ্বনি বড় সুন্দর শোনাত। নূপুরটি যে তারও বিশেষ এক গর্বের জিনিস ছিল, সে তার ব্যবহার দেখেও স্পষ্ট বোঝা যেত। 'বাক বাকুম' "বাক বাকুম" করতে করতে পায়চারি করবার সময় নূপুরটিতে বিশেষ একটি তাল দিয়ে বাজাতে রাজা কোনোমতেই ত্রুটি করত না।

সকাল হলেই রাজা আর তার অনুচরেরা ঝটপট করে তাদের খোপ থেকে বারান্দায় নেমে আসত। আমি তখন তাদের জন্য মেঝেতে ধান ছড়িয়ে দিতুম। তারা আগ্রহের সঙ্গে খুঁটে খুঁটে সেগুলো খেত, আর আমি মুগ্ধ নয়নে তাদের দেখতুম। রাজার ভোজনটা অবশ্য রাজার মতোই হত। আহার সাঙ্গ করে রাজা "বাক বাকুম" "বাক বাকুম" করতে করতে তার অনুচরদের দলে ঘুরে বেড়াত আর তারা ব্যস্ত–ত্রস্তভাবে তার জন্য পথ ছেড়ে দিত। কোনো কপোতকে কোনো কপোতীর ওপর অত্যাচার করতে দেখলে কিংবা প্রবল কপোতকে দুর্বল কপোতের ওপর জুলুম জবরদস্তি করতে দেখলে রাজা তাদের শাস্তিবিধানে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না। সে তার তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে ঠোকরাতে সেই অপরাধী পায়রাদের একেবারে নাজেহাল করে দিত। সে বেচারিরা তখন পালিয়ে আসবার সময় দণ্ডিত অপরাধীর মতো চুপ করে বসে থাকত; আর রাজা ঘন ঘন মাথা নেড়ে সরোষে মেঝের ওপর দ্রুত পদসঞ্চালন করে বেড়াত।

আমার সঙ্গে রাজার সৌহার্দ্য অল্প দিনের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। আমি রাজা বলে ডাকলে সে সগর্বে তার মুকুট নাড়াতে নাড়াতে আমার কাছে চলে আসত। আমি কখনও তাকে হাতে বসাতুম, কখনও কাঁধে বসাতুম, আবার কখনও তার সুবঙ্কিম ঠোঁটটিতে চুমো দিতুম। তখন রাজা "কু–উ–ম" "কু–উ–ম" বলে আনন্দে গলা ফুলোতে থাকত, আমার অন্তরেও আনন্দের লহর বয়ে যেত।

জলযোগ শেষ করে রাজা তার দলবল নিয়ে "চরাট" করতে চলে যেত। বিকেলে আমি তাদের প্রতীক্ষায় ছাদে উদগ্রীব হয়ে থাকতুম। বিকেলে আমি তাদের দেখলেই তাদের খোপের বারান্দায় গিয়ে হাজির হতুম, আর রাজাকে কোলে তুলে নিয়ে তার সংবর্ধনা করতুম। সেও আমার আদর পেয়ে গর্বে আনন্দে ফুলে উঠত।

নিয়মমতো এক দিন রাজা তার দলবল নিয়ে "চরাট" করতে চলে গেল। বিকেলে আমি তাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছি– রাজার দলকে সুদূর আকাশপথে ফিরতে দেখে দৌড়ে আমি খোপের বারান্দায় গেলুম। ঝপঝপ করে পায়রারা সব নিচে নেমে বসল। আজ কিন্তু রাজাকে তাদের মধ্যে দেখতে পেলুম না। কি এক অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় আমার প্রাণ কেঁপে উঠল। আমি একান্ত ঔৎসুক্যে এদিক ওদিক চেয়ে তার অনুসন্ধান করতে লাগলুম। দৌড়ে ছাদে গিয়ে আকাশের কোণটির দিকে চাইলুম, সেখানে তার কোনো চিহ্নই নেই। নিচে এসে আলিসার কোণে দেখলুম; খোপের ওপর দেখলুম, সেখানেও তার দেখা পেলুম না; তার যে বিশেষ কোনো বিপদ ঘটেছে, সে বিষয়ে তখন আমার সন্দেহ মাত্র রইল না। কাঁদতে কাঁদতে নানীজানের কাছে গিয়ে আমার দুঃখের কথা বললুম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– "আচ্ছা ভাই আর কেঁদো না। রাজার মতো তোমায় আর একটা পায়রা কিনে দেব।" আমার মন কিন্তু তাতে প্রবোধ মানল না। রাজার জন্য প্রচণ্ড উদ্বেগে আমি তারই কথা ভাবতে লাগলুম। দুই চোখ ছলছলিয়ে এল। এক বার মনে হল হয়তো কোনো নিষ্ঠুর শিকারীর বন্দুকের গুলির ঘায়ে আমার বন্ধুর প্রাণবিয়োগ হয়েছে। রাজা নেই একথা মনে হতে আরও দ্বিগুণ বেগে আমার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা বইতে লাগল। আবার ভাবলুম, না গুলিতে মরেনি, নিশ্চয় কোনো বদমায়েস ছেলে তাকে ফাঁদ পেতে ধরেছে। সে বেচারি আমার কাছে ফেরবার জন্য কত ছটফট করছে, আর সেই বদমায়েস চোর আমার রাজার ছটফটানি দেখে কী ক্রূর হাসি হাসছে! নানারকম ভাবনা চিন্তা করে শেষে স্থির করলুম, কাল সকালে রাজার জন্য এদিকে ওদিকে ভালো করে খোঁজ তল্লাশ করব। অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে তখন সে রাতের মতো শুতে গেলাম।

পরদিন আমার যেসব পরিচিত বালক বন্ধু পায়রা পালত তাদের বাড়ি গিয়ে রাজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। কারও কাছে কিন্তু কোনো সন্তোষজনক উত্তর পেলুম না। প্রত্যহ সকালে উঠেই আমি রাজার খোপের কাছে গিয়ে দেখতুম, আর তাকে সেখানে না পেয়ে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তুম। বিকেলে যখন আমার পায়রার ঝাঁক তাদের আকাশবিহার থেকে ফিরে আসত, আমি রাজাকে ফিরে পাবার আশায় দৌড়ে ছাদে গিয়ে তাদের জন্য প্রতীক্ষা করতুম। তারা সকলেই ফিরত কিন্তু আমার রাজা ফিরত না। আমার পায়রারাও সকলে যেন রাজাকে হারিয়ে শোকার্ত হয়ে পড়েছিল। রানী আলিসার এক কোণে চুপ করে বসে থাকত।

আহারের দিকে আগেকার সে আগ্রহ তার ছিল না। দলের মধ্যে নেচে হেসে ঘুরে ফিরে বেড়াবার প্রবৃত্তিও তার একেবারে চলে গিয়েছিল। সে তার রাজার অভাব বিশেষভাবেই অনুভব করছিল। রাজার সহচরদের মধ্যে আগেকার সে হাসি-খেলা, নাচ-গান, ঝগড়া-কলহ একেবারে চলে গিয়েছিল। তারা নিঃশব্দে শুতে চলে যেত। কেউ যেন কোনো প্রবল জীবনীশক্তির উচ্ছল প্রবাহ থেকে তুলে হঠাৎ তাদের নিরানন্দ এবং নিরুদ্যমের রুদ্ধ সলিলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

আমাদের গ্রামের পাশেই মোল্লাপাড়ায় রহিম নামে একটি ছেলে ছিল। বয়সে সে আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড় আর দুষ্টুমিতে সে আমাদের ছেলেমহলে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। পায়রা পোষবার ঝোঁক তারও ছিল। সে আমার পায়রা দেখতে কখনও কখনও আমাদের বাড়িতে আসত, আমি তার পায়রা দেখতে তার বাড়ি যেতুম। এ সূত্রে তার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। রাজার সে খুব তারিফ করত, বলত এমন পায়রা দেখা যায় না।

রাজাকে হারাবার তিন চার দিন পর রহিমের ওখানে তার পায়রা দেখতে গেলুম। সে তার বাড়ির সামনে খেলছিল, রাজা হারিয়ে গেছে শুনে সে আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে লাগল। আমাকে তার বাড়ির দিকে মুখ করতে দেখেই– "চল কামাল, বরজ পোতায় কুল পাড়িগে চল" বলে সে মাঠের দিকে পা বাড়াল। কোনো অদৃশ্য আকর্ষণ কিন্তু আমাকে তার বাড়ির দিকেই টেনে নিয়ে চলল। রহিমকে অগত্যা আমার অনুসরণ করতে হল।

রহিমের পায়রাগুলি বাড়ির উঠানে চরছিল। তাদের দেখতে দেখতে হঠাৎ রাজার ওপর আমার চোখ পড়ল। তার পায়ে এখন আর সে নূপুর নেই। ডানার পালকগুলি কাঁচি দিয়ে গোড়া পর্যন্ত কাটা। সে বেচারার ওড়বার শক্তি তখন একেবারে ছিল না। সে চুপ করে সকলের বাইরে কুণ্ঠিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে যে এক জন বন্দি, একথা সে যেন খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিল। এই অপরিচিত দলের জীবনে প্রবেশ করতে সে কোনো চেষ্টাই করছিল না।

আমি আনন্দে আটখানা হয়ে "রাজা রাজা" বলে ডেকে উঠলুম। আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে মুখ ফেরাল, আমাকে দেখে আনন্দে মাথা নাড়াতে নাড়াতে আমার কাছে এল। আমি তাকে হাতে করে বুকের কাছে তুলে নিলুম। আর "রাজা" বলে সাদরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। সেও তার স্নেহ-কোমল চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে "কু-উ-ম" "কু-উ-ম" বলে পুরানো বন্ধুর সংবর্ধনা করতে লাগল।

রহিম চোরের মতো চুপ করে এই পুনর্মিলন দেখছিল। ক্ষণিকের জন্য সে স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। আত্মসংবরণ করে শেষে বলে উঠল, "রাজা রাজা কী বলছিস কামাল? এ তো তোর পায়রা নয়। আমি যে একে পরশু দিন নবাবপুর থেকে কিনে এনেছি।"

তার এ নির্লজ্জ মিথ্যা কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম, "কী বলিস রহিম? এ আমার রাজা বই কি! আমি ডাকতেই কেমন চলে এল। আর দেখ, আমার কাছে কেমন চুপটি করে পড়ে আছে। অচেনা পায়রা হলে কী এমন করত?"

রহিম উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "তা বললে কী হয়! ও আমার পায়রা, ওকে ছেড়ে দে" কথাটা বলেই রাজাকে ধরবার জন্য সে হাত বাড়াল। পাছে রাজার চোট লাগে এই ভয়ে আমি তখন তাকে মাটিতে বসিয়ে দিলুম আর মিনতি করে বললুম– "ভাই, আমার পায়রা আমায় ফিরিয়ে দে।"

রহিম মাথা নেড়ে বলল, "তাও কি হয়, ও যে আমার কেনা পায়রা।"

আমি বলুম, "তাহলে আমি দাম দিচ্ছি আমার কছে বেচে ফেল।"

রহিম ধীরভাবে বললে, "আমি বেচব না।"

রাজাকে তার সেই ঘৃণিত কয়েদ থেকে উদ্ধার করবার কোনো উপায় না দেখে আমার মনটা একেবারে দমে গেল, আর আমার চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠল। পাছে রহিম আমার কান্না দেখতে পায়, এই ভয়ে সেখানে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করে আমি অতি ব্যস্তভাবে বাড়ির দিকে চলতে লাগলুম। দূর থেকে রহিমের নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর আমার কানে আসতে লাগল, "কোথা যাসরে কামাল? চল না বরজ পোতায় কুল পাড়িগে।" তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সজল চোখে আমি সেদিন বাড়ি ফিরলুম।

এই ঘটনার পর প্রায় দু সপ্তাহ কেটে গেছে। দৈনিক নিয়ম মতো বিকেলে আমার পায়রা গৃহ প্রত্যাবর্তনের জন্য আমি পথ চেয়ে আছি। রাজাকে ফিরে পাবার একটা ক্ষীণ আশা এক এক বার আমার অন্তরকে কাঁপিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠছে। আমি উৎসুকভাবে দিগন্তের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ আকাশের কোণে একটা ক্ষীণ রেখা দেখে বুঝলুম, আমার পায়রার দল বাড়ি ফিরছে। অন্য দিনের মতো আজও আশায় আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ কাঁপতে লাগল।

চোখ দুটিকে হাতের তলায় আড়াল করে আমি দেখতে লাগলুম পায়রার ঝাঁক ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। একে একে সকলকেই চিনতে পারলুম। কিন্তু রাজাকে আজও তাদের মধ্যে দেখতে পেলুম না। নিরাশ মনে আবার খোপের বারান্দায় নেমে এলুম। ঝপঝপ করে পায়রাগুলি নেমে এসে বসল; হঠাৎ কী যেন আমার দৃষ্টিকে আকাশের কোণে টেনে নিয়ে গেল। সুদূর চক্রবালে দেখলুম একটি পায়রা আমার বাড়ির দিকে মুখ করে শোঁ–শোঁ করে উড়ে আসছে। আমার নিরাশ মনে আবার আশার সঞ্চার হল। আমি রেলিং–এ ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করতে না করতে পায়রাটি কাছে এসে পৌছল, আর সোজা এসে ঝপ করে রেলিং–এর ওপর বসে পড়ল।

আমি আনন্দে নেচে উঠলুম। আমার রাজা আবার ঘরে ফিরেছে। সে সেই নিষ্ঠুর তস্করের হাত থেকে পালিয়ে তার বন্ধুজনের কাছে আবার ফিরে এসেছে। তিন সপ্তাহের দীর্ঘ বিরহে সে আমায় ভোলেনি, তার রানীকে ভোলে নি, তার বিহঙ্গম সহচর অনুচরদেরও ভোলেনি। সুযোগ পেয়েই সে নিঃসঙ্কোচে তার আপন জনের কাছে ফিরে এসেছে। রহিমের চালাকি তাকে আদৌ লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি।

আমি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তাকে বুকে তুলে নিয়ে তার মুখ চুম্বন করলুম। তারপর তাকে তার বন্ধুর দলে ছেড়ে দিলুম। তার উচ্ছ্বাসময় "বাক বাকুম" রবে আবার আমাদের বারান্দা ভরে গেল। আমার শোকসন্তপ্ত পায়রার দলের মধ্যে যেন কোন তড়িৎস্পর্শে তাদের পুরানো আনন্দ আবার ফিরে এল। রানী তার বিষাদের বিরল কোণ ছেড়ে আবার দলে এসে মিশল, আর মনের আনন্দে রাজার পাশে দলের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। আমি একান্ত তৃপ্তির সঙ্গে এই মধুর পুনর্মিলন দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বিশ্রামের জন্য পায়রারা যে যার খোপে চলে গেল। রাজা তার রানীর সঙ্গে আজ তাদের পুরানো খোপে ঢুকল। আমি সন্তুষ্ট মনে বাইরে এলুম।

রাজার পায়ে নূপুর নেই এ চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। আমি তখনই মাধব বেণের দোকান থেকে একটি সুন্দর নূপুর কিনে আনলুম। খাওয়া–দাওয়ার পর সেটাকে মাথার কাছে একটি টেবিলের ওপর রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। মনে মনে সংকল্প করলুম, সকালে উঠেই নূপুরটি রাজার পায়ে পরিয়ে দেব।

সে রাতটি আমার বেশ আনন্দেই কেটেছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাজার সাহসের কথা, তার মানুষের মতো বুদ্ধির কথা, তার বন্ধুবাৎসল্যের কথা ভাবতে লাগলুম। এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মধ্যে সে যে আমায় ভোলেনি এই কথা মনে করে আমার হৃদয় স্নেহে ভরে উঠল। দুষ্ট রহিম কেমন রাগে তার হাত মোচড়াচ্ছে আর গালিগালাজ করে তার মনের ভার লাঘব করছে, তা ভেবে আমি যথেষ্ট তৃপ্তি পেলুম। শুয়ে শুয়েই ঠিক করলুম, তাকে কাল রাজার ফেরবার খবর দিতেই হবে। তার মুখের অবস্থা যে কেমন হবে তা ভেবে যথেষ্ট আমোদ পেলুম। এসব সুখের খেয়ালের মধ্যে আস্তে আস্তে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠেই নূপুরটি নিয়ে নিচে বারান্দায় গিয়ে "রাজা" বলে ডাকতে লাগলুম। রাজার কোনো সাড়া না পেয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলুম। অন্যদিনের মতো পায়রাগুলি তাদের জলযোগের জন্য অপেক্ষা করছে না। কেউ ছাদে বসে কাঁদছে, কেউ জড়সড় হয়ে আলিসায় বসে আছে, আবার কেউ নারকেল গাছের ওপর বসে ভীত নেত্রে বারান্দার দিকে চাইছে। রানীকে দেখলুম আলিসায় একটি কোণে মরার মতো বসে আছে। কিন্তু রাজাকে কোথাও দেখতে পেলুম না। হঠাৎ বারান্দায় মেঝের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ল। যা দেখলুম তাতে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। মেঝেতে রাশি রাশি পালক ছড়ান রয়েছে, আর জায়গায় জায়গায় রক্তের বড় বড় দাগ। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে আমার বাকি রইল না। কোণের কাছে একটা মই দাঁড় করানো ছিল। রাতে সেই মই দিয়ে উঠে খাটাশে রাজাকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেঁড়া পালক আর রক্তের প্রাচুর্যে বুঝলুম রাজা, রাজার মতোই লড়াই করে মরেছে। আর থাকতে পারলুম না। "নানীজান নানীজান! আমার রাজাকে খাটাশে ধরেছে"– বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম।

আজ প্রায় ত্রিশ বছর হল রাজাকে হারিয়েছি। তারপর অনেক পাখি পুষেছি, অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক কাজ করেছি, কিন্তু রাজাকে ভুলতে পারিনি। তার সেই "বাক বাকুম" "বাক বাকুম" এখনও আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে, তার সেই সুন্দর মূর্তি এখনও আমার স্মরণে আঁকা রয়েছে। আর তার সেই করুণ গৃহ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি আজও আমার অন্তরকে ব্যথিত করে তুলছে।

লেখক-পরিচিতি

এস. ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বড়তাজপুর গ্রামে। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাস করেন। পরে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যান।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাশ করে কলকাতায় ফিরে এসে আইনব্যবসা শুরু করেন। কিছুকাল পরে আইনব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। উচ্চ সরকারি পদে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চায়ও নিরলস ছিলেন। মুসলমানদের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। গুলিস্তাঁ নামে তিনি একটি মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বাদশাহী গল্প, মাশুকের দরবার, দরবেশের দোয়া, গ্রানাডার শেষ বীর, ভবিষ্যতের বাঙালি, গুলদাস্তা ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এস. ওয়াজেদ আলি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শব্দার্থ

খোপ – পায়রার ঘর।
কপোত – কবুতর, পারাবত, পায়রা।
দুর্নিবার – যা নিবারণ করা যায় না।
দণ্ডিত – সাজাপ্রাপ্ত
সৌহার্দ্য – প্রীতির ভাব, হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব।
জলযোগ – নাশতা, হালকা খাবার।
উদগ্রীব – ব্যাকুল, আগ্রহী।
চরাট – আকাশে উড়ে বেড়ানো, এখানে পায়রাদের দল বেঁধে আকাশে ওড়াকে বোঝানো হয়েছে।
বিমর্ষচিত্ত – ব্যথাভরা মন।
চক্রবাল – দিগন্তরেখা।
প্রত্যাবর্তন – ফিরে আসা।
লক্ষ্যভ্রষ্ট – লক্ষ্যচ্যুত।
অনুসন্ধান – খোঁজ।
আলিসা – দালানের ছাদের কার্নিস।
ক্রূর – কুটিল।
ম্রিয়মাণ – মলিন, নিস্তেজ।
শোকার্ত – শোকে কাতর।
তারিফ – প্রশংসা।
বরজ – পানের বাগান।
নির্বাক – নীরব, কথা না বলা।
পোতা – উঁচু ভিত।
তস্কর – ডাকাত, লুটেরা।
বিহঙ্গম – পাখি।
সহচর – সঙ্গী, সাথি।
বাৎসল্য – মমত্ববোধ।
নেত্র – চোখ।

পাঠ-পরিচিতি

পাখি পোষার শখ কামালের। সে কবুতর পোষে। বলতে গেলে কবুতর পোষা রীতিমতো নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে তার। এক বার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে একটি কপোত ভারি পছন্দ হয় তার। অনেকগুলো পায়রার মধ্যে সেটি ছিল নজর কাড়বার মতো। রাজার মতোই চাল ছিল তার। কামাল আবদার জুড়ে সেটি বাড়িতে নিয়ে আসে। রাজাকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটে কামালের। এক দিন চরাট করতে গিয়ে রাজা ফিরে আসে না। পরে জানা যায়, রহিম নামের এক দুষ্ট ছেলে তাকে বন্দি করে রেখেছে। সুযোগ বুঝে ছাড়া পেয়ে রাজা ফিরে আসে তার প্রিয়জন কামালের কাছে। কিন্তু রাজাকে নিয়ে কামালের সুখের দিন বেশি দিন টিকল না। এক রাতে খাটাশের কবলে প্রাণ দেয় রাজা। রাজা যুদ্ধ করেই প্রাণ দিয়েছে খাটাশের হাতে– খোপের নিচে পড়ে থাকা পালকগুলোই ছিল তার প্রমাণ।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ গল্পটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা গল্পের বক্তব্য ও আঙ্গিক উপলব্ধি করবে এবং গল্পটি উপভোগ করবে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের মনে পাখির প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'রাজা' গল্পে কাকে 'নিষ্ঠুর তস্কর' বলা হয়েছে?
   ক. রহিমকে   খ. নানীজানকে
   গ. লেখককে   ঘ. রাজার অনুচরকে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
রহিম চোরের মতো চুপ করে এই পুনর্মিলন দেখছিল। ক্ষণিকের জন্য সে স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। আত্মসংবরণ করে শেষে বলে উঠল, "রাজা রাজা কী বলছিস কামাল? এ তো তোর পায়রা নয়। আমি একে পরশু দিন নবাবপুর থেকে কিনে এনেছি।"

৩. রহিম চোরের মতো চুপ করে কোন পুনর্মিলন দেখছিল?

ক. রাজা ও রানীর
খ. রাজা ও অন্যান্য কবুতরের
গ. রাজা ও কামালের
ঘ. রাজা ও নানীজানের

৪. 'আত্মসংবরণ' শব্দটির অর্থ–

i. আত্মাকে বরণ
ii. নিজেকে বরণ
iii. নিজেকে সামলানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। **অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

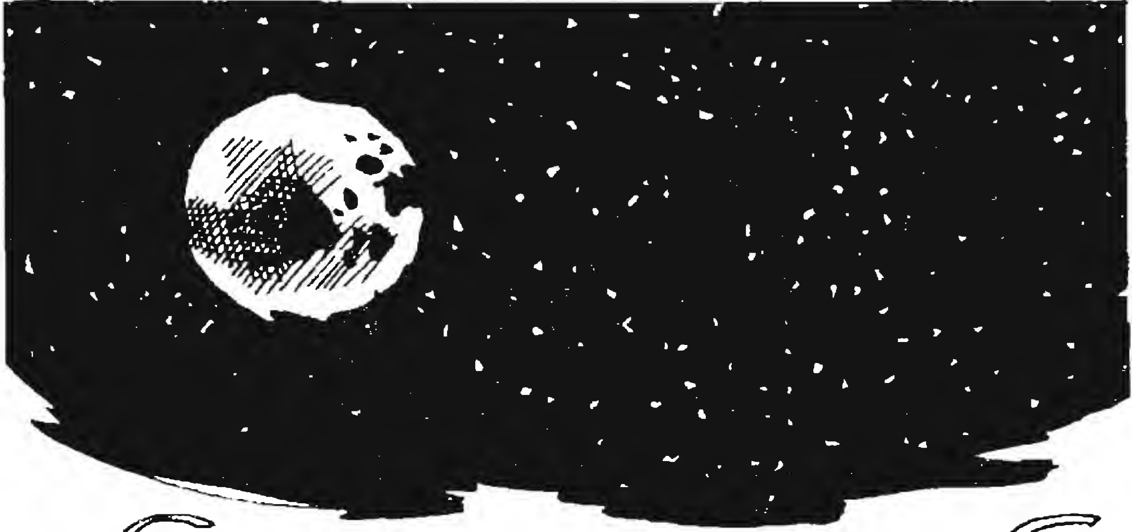
আমার সঙ্গে রাজার সৌহার্দ্য অল্প দিনের মধ্যেই বেশ জমে উঠল। আমি রাজা বলে ডাকলে সে সগর্বে তার মুকুট নাড়াতে নাড়াতে আমার কাছে চলে আসত। আমি কখনও তাকে হাতে বসাতুম, কখনও কাঁধে বসাতুম, আবার কখনও তার সুবঙ্কিম ঠোঁটটিতে চুমো দিতুম। তখন রাজা 'কু–উ–ম' 'কু–উ–ম' বলে আনন্দে গলা ফুলোতে থাকত, আমার অন্তরেও আনন্দের লহর বয়ে যেত।

ক. রাজা কে?
খ. রাজা ও কামালের সঙ্গে যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে তার পরিচয় দাও।
গ. 'মানুষ ও পাখি'র মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে'–অনুচ্ছেদ অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'আমার অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত'–উদ্দীপকের এ অংশটি বিশ্লেষণ কর।

২. **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং এর আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আজ প্রায় ত্রিশ বছর হল রাজাকে হারিয়েছি। তারপর অনেক পাখি পুষেছি, অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক কাজ করেছি, কিন্তু রাজাকে ভুলতে পারিনি। তার সেই 'বাক বাকুম' 'বাক বাকুম' এখনও আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে, তার সেই সুন্দর মূর্তি এখনও আমার স্মরণে আঁকা রয়েছে। আর তার সেই করুণ গৃহ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি আজও আমার অন্তরকে ব্যথিত করে তুলছে।

ক. কামাল কীভাবে রাজাকে হারিয়েছিল?
খ. 'তার সেই সুন্দর মূর্তি এখনও আমার স্মরণে আঁকা রয়েছে'–উদ্দীপকের এ অংশটি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'ত্রিশ বছর পরও কামাল রাজাকে ভুলতে পারেনি'–কী কারণে সে রাজাকে ভুলতে পারেনি তা 'রাজা' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখ।
ঘ. 'সেই করুণ গৃহ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি আজও আমার অন্তরকে ব্যথিত করে তুলছে'–এ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।



তারার দেশের হাতছানি

আবদুল্লাহ আল-মুতী

আমাদের চারপাশে হরদম কত কী যে ঘটেছে দুনিয়া জুড়ে! রোজই তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন খবর। তার মধ্যে একটা বড় খবর হল দিন-রাতের আনাগোনা। আর যত কিছুই ওলট-পালট হোক, দিন-রাতের নিয়মিত ছন্দে কোনো গরমিল হয় না।

ভোরে সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় কালো অন্ধকার কেটে গিয়ে আশ্চর্য স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে পৃথিবীর ওপরকার সব কিছুর। সূর্যের সোনালি আলো ধুয়ে দেয় দিনের আকাশকে। তারপর সারাদিন নীল আকাশ থেকে যেন ঝিরঝির করে ঝরতে থাকে এই আলোর ধারা।

রাতে সেই পৃথিবীর আবার একেবারে ভিন্ন চেহারা। কোথায় হারিয়ে যায় আকাশের তেজ-ঢালা সূর্য! দশ দিক ঢেকে যায় কালো অন্ধকারে। অন্ধকার আকাশের কালো চাঁদোয়ার বুকে ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকে হাজার হাজার আলোর বিন্দু। কখনও মিটিমিটি হাসে রুপালি চাঁদ।

বড় শহরের মতো গ্রামের আকাশ বিরাট দালান-কোঠা আর ধুলোবালিতে ঝাপসা নয়। তাই রাতের আকাশের দৃশ্য গ্রামেই খোলে ভালো। তার চেয়েও স্পষ্ট আকাশ মরুভূমির দেশে। সেখানে হাওয়া শুকনো, আকাশ মেঘহীন। যতদূর চোখ যায় বাড়িঘর গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। অনেকটা একই রকম অবস্থা খোলা সমুদ্রে, নৌকায়। চারপাশে পৃথিবীটাকে মনে হয় বিরাট চেপটা থালা। আর ওপরে জ্বলজ্বলে তারার চুমকিওলা চাঁদোয়াটা মনে হয় বিশাল এক গোল গম্বুজ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সেই আদ্যিকালের লোকদেরও চোখে পড়েছিল যে, মিটিমিটি আলো দেওয়া তারাগুলোকে বুকে নিয়ে আকাশটা যেন ধীরে ধীরে ঘুরপাক খায়। আবার স্থির আলো দেওয়া কতগুলো বিন্দু যেন অন্য তারাদের মধ্যে এলোমেলো পথে ঘোরাফেরা করে; এদের নাম দেওয়া হয় গ্রহ।

বহু হাজার বছর ধরে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কত কী যে ভেবেছে! কী আছে ওই আকাশে?

কী দিয়ে তৈরি ওই চাঁদ সূর্য তারার মেঘ? মাথার ওপর তারার চুমকি-বসানো বিশাল গম্বুজটা কি সত্যি সত্যি দূর দিগন্তে ছুঁয়েছে পৃথিবীর প্রান্ত! মাঝে মাঝে আকাশে ছোটে তারা, ঝলসে ওঠে ধূমকেতু। কী এদের রহস্য?

এমনি ভাবতে ভাবতে তৈরি হয়েছে সাত তবক আসমানে বাস করা দেবদেবীদের কাহিনী, কত রকম উপকথা। এই দুনিয়াটার আসল চেহারা কেমন সে সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানের কথাও তৈরি হয়েছে দিন–রাতের আকাশ দেখতে দেখতে। আর শুধু আকাশ নিয়ে ভাবনা–চিন্তা নয়, সেখানে যাবার স্বপ্নও দেখেছে মানুষ।

সেই আদ্যিকালে পৃথিবীর নানা এলাকায় মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে সুমের (আজ ইরাক যে এলাকায়) মিশর, চীন, ভারত, গ্রিস এসব জায়গার নাম করা যায়। আর সেকালে এসব এলাকার লোকেরা আকাশ আর পৃথিবী নিয়ে অনেক চিন্তা–ভাবনা করেছিলেন।

আকাশ নিয়ে চিন্তা–ভাবনা মানুষ যে নেহাত খেয়াল–খুশির বশে করত তা নয়। পশু চরানো আর চাষবাসের জন্য মানুষকে জানতে হত ঋতুর কথা, আবহাওয়ার কথা। কখন আসবে গ্রীষ্ম, কখন শীত, কখন বর্ষা, কখন প্লাবন। চাঁদ, সূর্য আর তারাদের আনাগোনার সাথে এসবের সম্বন্ধ বের করার চেষ্টা করত মানুষ।

মিশর, চীন, ভারতে বিশাল সব নদীর তীরে তীরে উর্বর এলাকায় বসত গেড়েছিল আদ্যিকালের মানুষ। এসব নদীতে দুকূল ছাপিয়ে আসত বন্যা। বন্যায় যেমন ভেসে যেত দুপাশে বহু লোকের ঘরবাড়ি, তেমনি বিরাট এলাকায় জমিতে পড়ত পলিমাটি–তাতে ফলত প্রচুর ফসল। বছরের কোন সময়ে এমনি বন্যা আসবে তার খবর রাখার নিয়ম বের করেছিল লোকে সূর্য আর তারার আনাগোনার হিসেব করে।

রাতে দূরের পথে যাবার সময় দিক ঠিক রাখার জন্য চিনতে হত তারাদের। বছরের দিনক্ষণের হিসেব রাখার জন্য খেয়াল রাখতে হত কখন কোন তারা আকাশে ওঠে। এসব হিসেব রাখা কি আর সাধারণ মানুষের কাজ। মন্দিরের পুরোহিতরাই রাখতেন এসব খবর, আর এসব খবর জানতেন বলে পুরোহিতদের ছিল বেজায় দাপট। সেকালে রাজ–রাজ–রাজাদেরও মেনে চলতে হত পুরোহিতদের কথা।

আদ্যিকালের লোকেরা পৃথিবী আর চারপাশের আকাশ সম্বন্ধে যেসব কথা ভাবত তার অনেক কথাই তোমাদের কাছে আজ অদ্ভুত মনে হবে। হয়তো শুনে হাসিও পাবে। প্রাচীন ভারতের লোকেরা ভাবত পৃথিবীটা হল একটা বিশাল ওলটানো থালার মতো, সেটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারটে হাতি। হাতিগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক কাছিমের পিঠে। কিন্তু কাছিমটা দাঁড়িয়ে আছে কিসের ওপর? এ প্রশ্নটা হয়তো তখন ওঠেনি, তাই তার জবাবও কেউ দেয়নি।

প্রাচীন গ্রিসের লোকেরা বলত পৃথিবীকে চালান দেবতারা আর তাঁদের কর্তা হলেন জিউস; তিনি পৃথিবীতে পাঠান বিজলির ঝলক। জিউসকে রোমানরা বলত জুপিটার। গ্রিকরা সূর্যদেবের নাম দিয়েছিল হিলিয়াস; রোমানরা তাঁকে বলত অ্যাপলো।

গ্রিস দেশের পূর্ব প্রান্তে আছে অলিম্পাস নামে এক উঁচু পাহাড়। গ্রিকরা ভাবত জিউস আর অন্য সব দেবতারা বাস করেন এই অলিম্পাসের চূড়ায়। রোজ সকালে হিলিয়াস তাঁর আগুনের মতো তেজী সব ঘোড়ায় টানা সূর্যরথে চেপে এই অলিম্পাস পাহাড়ের ওপর দেখা দেন পুবের আকাশে। তারপর সাঁঝের বেলা যাত্রা সাঙ্গ করে নেমে যান মাটির তলায়; সেখানে তাঁর রথের পরিশ্রান্ত ঘোড়ারা সারা রাত জিরিয়ে নেয়। এদিকে তারই পথ ধরে রাতের আকাশে এগিয়ে আসে তারার দল।

প্রাচীন গ্রিক কাহিনীর মতোই পুরানো– ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনীগুলো। এসব কাহিনীতে বলা হয়েছে, আকাশে বাস করেন দেবতা আর অসুররা। এই দেবতারা কেউ চালান সূর্যকে, কেউ সৃষ্টি করেন ঝড়বৃষ্টি। কখনও দেবতা আর অসুরদের মধ্যে বেধে যায় দারুণ লড়াই।

মানুষের আকাশে ওড়ার চেষ্টার কথাও আছে প্রাচীন কাহিনীতে। পুষ্পক রথ নামে এক রকম হাঁসে–টানা রথে আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার কথা আছে রামায়ণে। গ্রিক পুরাণে আছে ইকারাসের গল্প। ইকারাস পিঠে মোম দিয়ে পালকের ডানা লাগিয়ে উড়েছিল আকাশে। উড়তে উড়তে সে পৌঁছেছিল সূর্যের খুব কাছে। তার ফলে সূর্যের তাপে মোম গলে ক্ষয়ে পড়েছিল তার ডানা। তাই সে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে ডুবে যায়।

এমনি আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেছিলেন নাকি দিগ্বিজয়ী গ্রিক বীর আলেকজান্ডার। তিনি ঈগল–পাখি–টানা রথে চেপে যেতে চেয়েছিলেন স্বর্গে। তারও আগে একইভাবে শকুন–টানা রথে স্বর্গে পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন ব্যাবিলনের সম্রাট নমরুদ। তাঁদের কারও চেষ্টা সফল হয়নি।

পৃথিবী, আকাশ আর তারার দেশ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আজ অনেক পালটেছে। আজ আমরা জানি, পৃথিবী থালার মতো চেপটা নয়, বরং কমলা বা পেয়ারার মতো গোল। আর এই গোল পৃথিবীটা ঘুরছে সূর্যের চারপাশে।

পৃথিবীর চারপাশের আকাশ, সৌরজগৎ আর তারার দেশ সম্বন্ধে এমনি নতুন নতুন কথা জেনেই মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকেনি। বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বাইরে।

প্রথমে মানুষ উড়েছে পৃথিবীর হাওয়ায় ভেতর দিয়ে। তারপর উঠেছে হাওয়ার সীমার বাইরে। মানুষ গিয়ে নেমেছে চাঁদের বুকে। কয়েক হাজার মহাকাশ যান পাঠিয়েছে পৃথিবীর বাইরে– সৌরজগতের নানা প্রান্তে।

এককালে মানুষের দুনিয়া ছিল ছোট; আজ তা হয়ে উঠেছে অতি বিশাল। পরিষ্কার আকাশে আমরা খালিচোখে দেখতে পাই মাত্র দু হাজার থেকে তিন হাজার তারা। এককালে লোকে ভাবত, মানুষ মারা গেলে তার আত্মা ছায়াপথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছে। আজ আমরা জানি, আসলে এই ছায়াপথে রয়েছে নানা মাপের আর নানা বয়সের প্রায় দশ হাজার কোটি তারা (তার মধ্যে সূর্যও একটি)। প্রতি সেকেন্ডে একটি করে তারা গুনে গেলে এতগুলো তারা গুনতে তিন হাজার বছর পেরিয়ে যাবে।

কিন্তু এই তো শেষ নয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মহাবিশ্বে ছায়াপথের মতো এমনি তারার পুঞ্জ আছে অন্তত একশ কোটি। তাহলে এখন বোঝ, মহাবিশ্বে মোট তারার সংখ্যা হবে কত? এসব তারার যদি একশর মধ্যে একটিতে সূর্যের মত গ্রহজগৎ থাকে, আর লক্ষ কোটি গ্রহজগতের মধ্যে একটিতে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহলেও পৃথিবীর বাইরে সভ্যতার দেখা মিলতে পারে অন্তত দশ লাখ জায়গায়।

এসব ভাবলে মনে হয় আমাদের পূর্বপুরুষেরা দুনিয়া সম্বন্ধে কত যে কম জানত! কিন্তু কম জানলেও আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগের মানুষেরা পৃথিবী, আকাশ আর বিশ্বের নানা রহস্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কম করেনি। আজ আমরা যেসব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি তা চার-পাঁচ হাজার বছর আগের মানুষকেও ভাবিয়ে তুলেছিল; এ-ও তো একেবারে হেলাফেলার খবর নয়।

লেখক-পরিচিতি

আবদুল্লাহ আল-মুতী সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়ি গ্রামে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন। তাঁর শিক্ষাজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এসসি. এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি শিক্ষকতা ও শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সচিবের পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। একজন বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ করে লিখেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'অবাক পৃথিবী', 'রহস্যের শেষ নেই', 'জানা অজানার দেশে', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'বিজ্ঞান ও মানুষ' 'সাগরের রহস্যপুরী', 'মেঘ-বৃষ্টি-রোদ', 'এ যুগের বিজ্ঞান', 'তারার দেশের হাতছানি', 'প্রাণলোক নতুন দিগন্ত' ইত্যাদি। বিজ্ঞানশিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তিনি ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত 'কলিঙ্গ' পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী মহাকাশের বিচিত্র জগৎ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। তার মনে বিজ্ঞানবিষয়ক কৌতূহল জাগ্রত হবে।

শব্দার্থ

হরদম – সব সময়।
গরমিল – মিলের অভাব।
পুরাণ – পুরাকালের সমাজ ও ধর্মবিষয়ক কাহিনী।
চাঁদোয়া – ছাউনি, শামিয়ানা।
উপকথা – কল্পিত গল্প, কাহিনী, উপাখ্যান।
তবক – স্তর, পাত।
পুরোহিত– যাজক, যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি

গম্বুজ – মসজিদের ওপর গোল চূড়া।

কাছিম – কচ্ছপ।

আদ্যিকাল – আদিকাল, অতি প্রাচীন কাল।

পরিচালনা করেন।

ছায়াপথ – নক্ষত্ররাজি ও নীহারিকা–পরিপূর্ণ। আকাশপথ, আকাশ–গঙ্গা।

হেলাফেলা– অবহেলা।

টীকা

মহাবিশ্ব – মহাকাশে অসংখ্য ছায়াপথ রয়েছে। এ সকল ছায়াপথে রয়েছে অজস্র নক্ষত্র ও নীহারিকা। ছায়াপথগুলো নিয়েই রচিত মহাবিশ্ব।

রামায়ণ – মহাকবি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। এ মহাকাব্যে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ মহাকাব্য সাত কান্ড বা সাত খন্ডে বিভক্ত। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ।

মহাভারত – বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। এতে কুরুপান্ডবের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটি আঠারোটি পর্বে বিভক্ত। মহাভারত হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ।

হাওয়ার সীমা – বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর ওপরের বায়ুরাশি যেখানে শেষ হয়েছে।

সৌরজগৎ–সূর্য এবং তার চার পাশে প্রদক্ষিণরত নয়টি গ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাবিশ্বের অসংখ্য ছায়াপথে নক্ষত্ররাজিকে ঘিরে সৌরজগতের মতো আরও অনেক গ্রহজগৎ বর্তমান।

পুষ্পক রথ– হিন্দু পুরাণে পুষ্পক রথের উল্লেখ রয়েছে। হাঁসে–টানা এই রথ আকাশের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে রামায়ণে।

পাঠ-পরিচিত

'তারার দেশের হাতছানি' লেখকের এই নামের গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধটি মহাকাশের বিচিত্র জগৎ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলী করে তোলে। দিনের শেষে রাত আবার রাতের শেষে দিন আসে। দিনের আকাশে তেজ–ঢালা সূর্য আর রাতের আকাশে হাজার তারার মেলা। আকাশ আর পৃথিবী নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার শুরু আদিকাল থেকেই। এ নিয়ে নানা গল্প কাহিনী তৈরি করেছে মানুষ। আকাশ আর তারার দেশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত গবেষণা করে চলেছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, মহাবিশ্বে ছায়াপথের মতো তারার পুঞ্জ রয়েছে অন্তত একশ কোটি। এসব তারার যদি একশর মধ্যে একটিতে সূর্যের মতো গ্রহজগৎ থাকে, আর লক্ষ কোটি গ্রহজগতের মধ্যে একটিতে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহলে পৃথিবীর বাইরে আরও দশ লাখ পৃথিবীর সন্ধান মিলতে পারে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন এলাকাকে 'সুমেরু' বলা হত?

ক. মিশর খ. ইরান
গ. ইরাক ঘ. সিরিয়া

২. মহাবিশ্বে ছায়াপথের মতো তারাপুঞ্জের সংখ্যা আনুমানিক কত কোটি?

ক. একশ খ. দুশ
গ. তিনশ ঘ. চারশ

৩. 'এককালে মানুষের দুনিয়া ছিল ছোট; আজ তা হয়ে উঠেছে অতি বিশাল।' –কীভাবে?

i. পৃথিবী ক্রমাগত বড় হয়ে যাচ্ছে
ii. নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ফলে
iii. মানুষ বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর বাইরে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কী দিয়ে তৈরি ওই চাঁদ, সূর্য, তারা, মেঘ? মাথার ওপর তারার চুমকি বসানো বিশাল গম্বুজটা কি সত্যি সত্যি দূর দিগন্তে ছুঁয়েছে পৃথিবীর প্রান্ত! মাঝে মাঝে আকাশে ছোটে তারা, ঝলসে ওঠে ধূমকেতু। কী এদের রহস্য?

৪. উপরের অনুচ্ছেদে 'গম্বুজ' দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?
ক. চাঁদকে খ. সূর্যকে
গ. আকাশকে ঘ. মসজিদের গোল চূড়াকে

৫. নিচের কোন দুটির মধ্যে মিল রয়েছে?
ক. চাঁদ ও সূর্য খ. সূর্য ও তারা
গ. চাঁদ ও তারা ঘ. তারা ও ধূমকেতু

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

আকাশ আর পৃথিবী নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার শুরু আদিকাল থেকেই। মহাকাশের বিচিত্র জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ক্রমাগত গবেষণা করে চলেছেন। আজ আমরা জানি, পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল। আর এই গোল পৃথিবীটা ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য এবং তার চারপাশের প্রদক্ষিণরত নয়টি গ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। মহাকাশে অসংখ্য ছায়াপথ রয়েছে যার সংখ্যা আনুমানিক একশত কোটি।

ক. 'তারার দেশের হাতছানি' প্রবন্ধটির লেখক কে?
খ. উদ্ধৃত অংশটি অবলম্বনে মহাকাশ সম্পর্কে তোমার ধারণা লেখ।
গ. আকাশ এবং পৃথিবী নিয়ে উপরের অনুচ্ছেদে যে বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে 'তারার দেশের হাতছানি' প্রবন্ধে বর্ণিত গ্রিকদের ভাবনার কী পার্থক্য রয়েছে? উপস্থাপন কর।
ঘ. 'মহাবিশ্বে এমনি তারার পুঞ্জ রয়েছে আনুমানিক একশত কোটি' এ উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য 'তারার দেশের হাতছানি' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখ।

২. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বড় শহরের মতো গ্রামের আকাশ বিরাট দালান–কোঠা আর ধুলোবালিতে ঝাপসা নয়। তাই রাতের আকাশের দৃশ্য গ্রামেই খোলে ভালো। তার চেয়ে স্পষ্ট আকাশ মরুভূমির দেশে। সেখানে হাওয়া শুকনো, আকাশ মেঘহীন। যতদূর চোখ যায় বাড়িঘর গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। অনেকটা একই রকম অবস্থা খোলা সমুদ্রে, নৌকায়। চারপাশে পৃথিবীটাকে মনে হয় বিরাট চেপটা থালা। আর ওপরে জ্বলজ্বলে তারার চুমকিঅলা চাঁদোয়াটা মনে হয় বিশাল এক গোল গম্বুজ।

ক. রাতে আকাশের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায় কোথায়?
খ. 'চারপাশে পৃথিবীটাকে মনে হয় বিরাট চেপটা থালা' অনুচ্ছেদটি অবলম্বনে এ উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।
গ. উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে মরুভূমির রাতের আকাশের যে ছবি আঁকা হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের দেশের রাতের আকাশের দৃশ্যের তুলনা কর।
ঘ. 'ওপরে জ্বলজ্বলে তারার চুমকিঅলা চাঁদোয়াটা মনে হয় বিশাল এক গোল গম্বুজ'–এ বাক্য অবলম্বনে মরুভূমির রাতের আকাশের সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসলাম। রুমী জামী ছুটে এল এ ঘরে। কী ব্যাপার? দু'তিন রকমের শব্দ– ভারী বোমার বুমবুম আওয়াজ, মেশিনগানের ঠাঠাঠাঠা আওয়াজ, চিঁ–ই–ই–ই করে আরেকটা শব্দ। আকাশে কী যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে, তার আলোয় ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠছে। সবাই ছুটলাম ছাদে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল), মহসীন হল, আরও কয়েকটি হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশির ভাগ আওয়াজ সেদিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ, চিৎকার। বেশিক্ষণ ছাদে দাঁড়ানো গেল না।

২১শে এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

রুমীর সাথে কদিন ধরে খুব তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ....রুমীর কি এখন যুদ্ধ করার বয়স? এখন তো তার লেখাপড়া করার সময়, কেবল আই.এসসি. পাস করা এক ছাত্র, এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে, আবার আমেরিকার ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতেও ওর অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। এ বছরের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হবে। ওকে আমেরিকা যেতে হবে আগস্টের শেষ সপ্তাহে। সেখানে গিয়ে চার বছর পড়াশুনা করে তবে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর এই সময় সে কিনা বলে সে যুদ্ধ করতে যাবে? .....রুমী বলল, আম্মা শোনো, ছাত্রজীবন লেখাপড়া করার সময় এ সবই চিরকালীন সত্য, কিন্তু ১৯৭১ সালের এই এপ্রিল মাসে এই চিরকালীন সত্যটা কি মিথ্যে হয়ে যায় নি? চেয়ে দেখ, দেশের কোথায় সুস্থ– স্বাভাবিক জীবনধারা বজায় আছে? কোথাও নেই। সমস্ত দেশটা পাকিস্তানি মিলিটারি জান্টার টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা হয়ে উঠেছে। রোমান গ্ল্যাডিয়েটারের চেয়েও আমাদের অবস্থা খারাপ। একটা গ্ল্যাডিয়েটারের তবু কিছুটা আশা থাকত, একটা সিংহের সঙ্গে ঝুটোপুটি করতে করতে সে জিতেও যেতে পারে। কিন্তু এখানে? সেই ঝুটোপুটি করার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। হাত আর চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, কট্‌কট্ করে কতকগুলো গুলি ছুটে যাচ্ছে, মুহূর্তে লোকগুলো মরে যাচ্ছে। এরকম অবস্থার মধ্যে লেখাপড়া করে মানুষ হবার প্রক্রিয়াটা খুব বেশি সেকেলে বলে মনে হচ্ছে না কি?

'তুই তো এখানে পড়বি না। আই. আই. টি.–তে তোর ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, তোকে নাহয় কয়েক মাস আগেই আমেরিকা পাঠিয়ে দেব।'

'আম্মা, দেশের এরকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়তো বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব; কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনোদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা?'

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনোদিনই বিতর্কে হারেনি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন?

আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম, 'না, চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধেই যা।'



৮ই আগস্ট বুধবার ১৯৭১

....রুমী এসে ঢুকল ঘরে। রুমীর মুখভর্তি দাড়ি, চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, তামাটে গায়ের রং রোদে পুড়ে কালচে, দুই চোখে উজ্জ্বল ঝকঝকে দৃষ্টি, গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ফুটে রয়েছে সেই ভুবন–ভোলানো হাসি।

রাতে খাওয়া–দাওয়ার পর আমাদের বিছানায় সবাই গোল হয়ে বসলাম। বললাম, 'এবার বল তোর কাহিনী।'

রুমী একটু হাসল, 'কাহিনী যা, তা প্রায় রূপকথার মতোই। মেলাঘরে গিয়ে দেখি– ঢাকার যত কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা, ধানমন্ডি–গুলশানের বড়লোক বাপের গাড়ি–হাঁকানো ছেলেরা, খেলার মাঠের চৌকস ছেলেরা, ছাপোষা চাকুরে বাপের ছেলেরা, সব্বাই ওখানে জড়ো হয়েছে। সবাই যুদ্ধ করবার জন্য গেছে। ওখানে গিয়ে আমার আগের চেনা কত ছেলেকে যে দেখলাম! ঢাকা থেকে আগরতলার দিকের এই বর্ডারটা সবচেয়ে কাছে বলে ঢাকার প্রায় সব ছেলেই এ রাস্তা দিয়ে বর্ডার ক্রস করে। তারপর সেক্টর 'টু'– এর ওপর দিয়েই অনেকে অন্য সেক্টরে চলে যায়। ঢাকা জেলা কিন্তু সেক্টর টু –এর আন্ডারে, তাই আমরা বেশিরভাগ ঢাকার ছেলেরা সেক্টর টুতেই আছি। দেশের চারদিকের বর্ডার ঘিরে যুদ্ধ চলছে, বর্ডারের ঠিক ওপাশেই ভারতের মাটিতে আমাদের সেক্টরগুলোর হেড কোয়ার্টার্স। রেগুলার বাংলাদেশ আর্মির পাশাপাশি আমরা আছি গেরিলা বাহিনী।'

স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বি.বি.সি. থেকে এসবই শুনে আসছি, কিন্তু সে যেন নেহাত শোনা কথা ছিল। বিশ্বাস করতাম, সত্য বলে জানতাম কিন্তু তবু যেন মন ভরত না। এখন রুমীর মুখে শুনে সমস্তটাই যেন একেবারে বুকের ভেতরে গেঁথে গেল।

....রুমী বলল, 'মনে আছে? সেই যে নতুন পাস করা, নতুন বিয়ে করা ডাক্তারটা, আসল নাম আখতার আহমদ।'

'তাঁর কী হয়েছে?'

'সেই ডক্ সেক্টর টুতে আছে। তার বউ–ও।'

'বলিস কী? অদ্ভুত যোগাযোগ তো!'

'শুধু কি এটুকু? আরও আছে। লুলু আপা, টুলু আপাও ওখানে।'

'ওরাও? ওরা ওখানে কী করছে?'

'সেক্টর টুতে একটা হাসপাতাল করা হয়েছে। ডক ওখানে ডাক্তার, খুকু ভাবি, লুলু-টুলু আপারা ওখানে নার্স।'

রুমী বলল, 'আরও কী মজা জানো আম্মা? আমি ঢাকা থেকে যাই ১৪ই জুন, লুলু-টুলু আপারা অনেকে মিলে একটা বিরাট দল যায় ১৫ই জুন। ১৩ই জুন আমি ওদের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ কাউকে যাওয়ার কথা বলিনি। আমরা যাই মনু ভাইদের সঙ্গে, ওদের দলকে নিয়ে যায় শাহাদত ভাই। ওরা সোনামুড়ার হাসপাতালে যায়। তিন-চারদিন পরে আখতার ভাই ওদেরকে নিয়ে মেলাঘরে বেড়াতে আসে, তখন নাটকীয়ভাবে ওদের সঙ্গে আমার দেখা।'

আখতার ভাইয়ের কাহিনী তো আরও রোমাঞ্চকর। আখতার ভাই এ বছর জানুয়ারি মাসে আর্মিতে ডাক্তারের চাকরি পেয়েছিল। কুমিল্লায় ফোর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ওর পোস্টিং হয়েছিল। মার্চের মাঝামাঝি ঐ ফোর্থ ইস্টবেঙ্গালের দুটো কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলি করা হয়। মেজর শাফায়াত জামিল, আখতার ভাই এঁরাও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে যান। আসলে এই বদলি করাটা পাকিস্তানিদের একটা ষড়যন্ত্র ছিল। খালেদ মোশাররফকেও মার্চের শেষে কুমিল্লায় ঐ ফোর্থ ইস্টবেঙ্গালে বদলি করা হয়। তার আগে খালেদ ভাই ঢাকায় কোনো এক ব্রিগেডে ব্রিগেড-মেজর ছিলেন। ক্র্যাকডাউনের ঠিক আগে আগে খালেদ ভাইকে তার কম্যান্ডিং অফিসার একটা ছুতো করে সিলেটের শামসেরনগরে পাঠিয়ে দিল। ওখানে নাকি নকশালরা ভারত থেকে ঢুকে উৎপাত করছে। তাদের দমন করার জন্য এক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে তাকে যেতে বলা হয়। খালেদ ভাই ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন পাকিস্তানিরা কিছু একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র আঁটছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই কোম্পানি সৈন্য পাঠানো হয়েছে। আবার তাকে এখন আরেক কোম্পানি সৈন্য নিয়ে শামসেরনগর যেতে বলা হল। খালেদ ভাই বুঝতে পারছিলেন এভাবে ইস্টবেঙ্গাল রেজিমেন্ট থেকে কোম্পানি এদিক-ওদিক সরিয়ে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। খালেদ ভাই একটুখানি সাবধান হয়েছিলেন, যার জন্য তাঁর জীবন বেঁচে যায়। তিনি মেইন রোড দিয়ে না গিয়ে অন্য একটা কাঁচা রাস্তা ধরে শামসেরনগর যান। গিয়ে দেখেন কোথায় কী। নকশালদের চিহ্নমাত্র নেই। পরে জানতে পারেন মৌলভীবাজারের কাছে মেইন রোডের পাশে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সৈন্য লুকিয়ে ছিল খালেদ ভাইদের অ্যামবুশ করার জন্য।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হয়েছে কি-মেজর শাফায়াত জামিল, আখতার ভাই আর অন্য যাঁরা ছিলেন, সবাই জেনে গেছেন ঢাকায় কী হয়েছে, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কী হয়েছে। রাগে, উত্তেজনায় তাঁদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কাজেই ২৭শে মার্চ সকালেই শাফায়াত জামিলের সঙ্গে আখতার ভাই আর অন্য সবাই রিভোল্ট করে ওখানকার পাকিস্তানি অফিসারদের গ্রেপ্তার করে ফেলেন। শাফায়াত জামিল আগেই আখতার ভাইকে একটা স্টেনগান ইস্যু করে দিয়েছিলেন লুকিয়ে, কারণ ডাক্তারদের অস্ত্র দেবার কোনো নিয়ম ছিল না। ওদিকে মেজর খালেদ মোশাররফও শামসেরনগর থেকে ফেরত এসে শাফায়াত জামিলদের সঙ্গে যোগ দেন।

কিছুদিন পর খালেদ মোশাররফ যখন ভারতের ভেতরে সোনামুড়ায় তাঁর ঘাঁটি নিয়ে যান, তখন আখতার ভাইও সেখানে যান। খালেদ ভাই এবার তাঁকে ক্যাম্প হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নিতে বলেন। ততদিনে বর্ডারে যুদ্ধটুদ্ধ বেশ হচ্ছে। দু একজন করে মুক্তিযোদ্ধা জখমও হচ্ছে।

সোনামুড়ায় একেবারে বর্ডার ঘেঁষে শ্রীমন্তপুর বলে একটা বর্ডার আউটপোস্ট আছে। সেটার কাছে একটা স্কুলঘরে খালেদ মোশাররফ তাঁর ক্যাম্প করেছেন। পাশেই একটা গোয়ালঘর আখতার ভাইকে দেওয়া হল রোগী দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। আখতার ভাই লম্বা তক্তা যোগাড় করে ঘরের দুপাশে খুঁটির ওপর পাতল, একটা হল রোগীর বেড, অন্যটায় ওষুধপাতি, গজ-ব্যান্ডেজ সাজিয়ে রাখল। সেটাই হল সেক্টর 'টু' -এর সর্বপ্রথম এক বেডের ক্যাম্প হাসপাতাল।

পরে সোনামুড়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা বড় ডাকবাংলায় হাসপাতাল সরিয়ে নেওয়া হয়। এখন হাসপাতাল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। আরও অনেক ডাক্তার-নার্স এসে যোগ দিচ্ছে।

আমি নিশ্বাস ফেলে বল্লাম, 'সত্যিই। রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর এসব কাহিনী। শুনে বড় ভালো লাগছে। তুই যে ওখানে গিয়ে আপনজন পেয়েছিস, তাতেই আমার শান্তি। তা সোনামুড়া মেলাঘর থেকে কতদূর? প্রায়ই যাস্ নাকি?'

'হাসপাতাল এখন আর সোনামুড়ায় নেই তো। জায়গাটা বর্ডারের খুব কাছে ছিল, ওখান থেকে দারোগা বাগিচা বলে একটা জায়গায় সরানো হয়। এখন বিশ্রামগঞ্জ বলে আরেকটা জায়গায় সরানো হয়েছে। এখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে বলে ঠিক হয়েছে। মেলাঘর থেকে মাইল আস্টেক দূরে। আমি মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে যাই ওখানে।'

'কীরকম হাসপাতাল?'

'বেড়ার ঘর, বাঁশের মাচার বেড়, তাতে খড়ের গদি। ডাক্তার, নার্সদের থাকার জায়গাও ওইরকম বেড়ার ঘরে মাচার বেড। আখতার ভাই শুধু ডাক্তরিই করে না, ফাঁক পেলেই স্টেনগান হাতে অ্যাকশনে বেরিয়ে যায়। একবার হল কি, হাসপাতালে ওষুধপত্র নেই, আখতার ভাই একটা জিপে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে এক জায়গায় বর্ডার ক্রস করে ইস্ট পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে এক হাসপাতাল লুট করল। ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওষুধপত্র, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, গজ-ব্যান্ডেজ সব একেবারেই সা-ফ তুলে নিয়ে এল। আবার, মজা করে একটা রসিদ লিখে রেখে এল- বাংলাদেশের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য এসব জিনিস নেওয়া হল।'

'মেলাঘরে তোরা কীভাবে থাকিস? কী খাস? জায়গাটা কীরকম? গ্রাম? না আধাশহর?'

'গ্রামও না, আধাশহরও না, একেবারে পাহাড়ি জঙ্গলে জায়গা। টিলার ওপরে বেড়ার ঘরে, তাঁবুতে আমরা থাকি। খাওয়াদাওয়ার কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না। ওটার কষ্টই সবচেয়ে বেশি।'

জামী ফোড়ন কাটল, 'হ্যাঁ, তুমি তো আবার একটু খেতে ভালোবাস!'

'কী খাবার দেয় সাধারণত?'

'ভাত আর ডাল। কখনও লাবড়া, কখনও মাছ। সকালের নাশতা রুটি আর ঘোড়ার ডাল।'

আমি আঁতকে উঠলাম, 'ঘোড়ার ডাল? সে আবার কী?'

'চোকলা-মোকলাসুদ্ধ এক ধরনের গোটা গোটা ডাল, নর্মাল টাইমে বোধ হয় ঘোড়াকে খাওয়ানো হয়। আর রুটি? জানো আম্মা, কতদিন সে রুটির মধ্যে সেঁকা পোকা পেয়েছি।

'পেয়ে কী করতিস? রুটি ফেলে দিতিস?'

ফেলে দেব? তুমি কি পাগল হয়েছ আম্মা? সেঁকা পোকাটা নখে খুঁটে ফেলে দিয়ে রুটি খেয়ে নিতাম।

২৫শে আগস্ট বুধবার ১৯৭১

দরজায় ঘনঘন বেল। বেল টিপে আর যেন ছাড়েই না; শরীফ, জামী ওপরে বাবার কাছে। আমিই রান্নাঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল রুমী, কাজী আর অচেনা একটি অল্পবয়সী ছেলে। আমি অবাক, মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে। তিন জনেরই মুখ লাল। ঠোঁট টিপে শান্ত হয়ে রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হল ওদের ভেতরে চাপা উল্লাস আর হাসি ফুলে ফুলে উঠছে। রুমী ঢুকেই দরজা বন্ধ করে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে বলল, 'আম্মা, ওপরে চলো, কথা আছে।'

দোতলায় রুমীর ঘরে এসে সবাই ঢুকলাম। হলে বসা শরীফ আর জামী আমার হাতের ইশারায় পিছু পিছু এল। রুমী চাপা আনন্দ আর উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, 'আম্মা, আব্বু, আমরা একটা অ্যাকশন করে এলাম এইমাত্র। সাত-আটটা খানসেনা মেরে এসেছি।'

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল, 'বলিস কিরে?'

আনন্দ-ডগমগ গলায় কাজী বলল, 'হ্যাঁ চাচি, ১৮ নম্বর রোডে। ওখানে একটা বাড়ির সামনে আমরা গাড়ি থেকে গুলি করে খানসেনা মেরে পাঁচ নম্বর রোড দিয়ে আসছিলাম। মিলিটারি জিপ পিছু নিয়েছিল। রুমী তাই দেখে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে গুলি চালায়। ওর দুই পাশ থেকে স্বপন বদিও গুলি করে। জিপ উল্টে সবগুলো মরেছে।'

রুমী বলল, 'আম্মা দেখ, আমার ঘাড়ে, কাঁধে স্টেন থেকে আগুনের ফুলকি ছুটে কীরকম ফোসকা পড়ে গেছে। রাস্তায় মিলিটারি ধরলে এজন্যই ফেঁসে যাব।' রুমির শার্টের কলার সরিয়ে দেখলাম– গলায় কাঁধে অনেকগুলো কালো কালো ছোট ছোট ফোসকা। শার্টও ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে হল'?

রুমী বলল, 'স্টেনগান ফায়ার করার সময় তার গা দিয়ে আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোয়। আমার ঘাড়ের দু'পাশ থেকে বদি ভাই, স্বপন ভাই ফায়ার করেছে তো, তাই আগুনের ফুলকিগুলো আমার গায়েই পড়েছে।' তারপর, হাসতে হাসতে বলল, 'উঃ। কানে এমন তালা লেগে গেছে, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না।'

ডেটল-তুলো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে করতে বললাম, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে কী কাণ্ড? কী করে করলি?'

'বলব পরে। পাশের গলিতে এক বাড়িতে অস্ত্র রেখে এসেছি। এক্ষুনি নিয়ে আসতে হবে। তোমাকে যেতে হবে গাড়ি নিয়ে। মহিলা ড্রাইভার দেখলে ওরা গাড়ি থামাবে না-আশা করা যায়। আমি যাব তোমার সঙ্গে। কাজী ভাই, সেলিম, তোমরা ছাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। আমরা অস্ত্র নিয়ে আসছি। আম্মা, দুটো ছালা নিয়ে নাও। আব্বু, আমরা যাবার পর পোর্চের বাতি নিভিয়ে রেখো। যদি মেহমান আসে, তাহলে জ্বালিয়ে রেখো। পোর্চে বাতি দেখলে আমরা ঢুকব না।'

গাড়ি ব্যাক করে রাস্তায় নামলাম। রুমী পেছনে বসল। পাশের গলিটা একেবারে পাশেই। মেইন রোডে উঠে দুটো বাড়ি পরেই গলিতে ঢোকার মুখে রুমী চাপা স্বরে বলল, একদম গলির শেষ মাথায় চলে যাও।' বলা বাহুল্য, এ গলিটাও কানা, আমাদের গলির মতোই।'

আমিও ফিসফিসিয়ে বললাম, 'শেষ মাথার বাড়িটা হাই সাহেবের যে! ওই বাড়িতে?' 'না। ঢুকে দুটো বাড়ির পরে, ডান-হাতি। কিন্তু গাড়িটা শেষ মাথায় নিয়ে আগে দেখব কেউ ফলো করছে কি না।'

আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেটের মুখে দাঁড়ালাম। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। রুমী বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি হেঁটে দেখে আসি ও-বাসায় বাইরের লোক কেউ আছে কি না।'

রুমী ফিরে এসে চুপি চুপি বলল, 'চলো। আস্তে চালাবে।'

গাড়ি ব্যাক করে আবার গলিতে। নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে রুমী থামতে বলল। এবার বাঁয়ে গাড়িটা। আমি গেট ঘেঁষে গলিতেই গাড়ি পার্ক করে গাড়িতে বসে রইলাম। রুমী বস্তা দুটো নিয়ে ভেতর চলে গেল। তার ফিরে আসার সাড়া পেতেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পেছনের বুট খুলে দিলাম।

এ গলি থেকে পাশের গলি– কতটা পথ? পোয়া মাইল? তাও হবে কি না সন্দেহ। কিন্তু বুকে এমন ধুকপুকুনি, মনে হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল চালিয়ে এসেছি।

পোর্চের বাতি নেভানো। শরীফ, জামী বুঝিবা দরজার ওপাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি থামতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল। রুমী বুট খুলল। সঙ্গে সঙ্গে গেট দিয়েও কে যেন ঢুকল। আমরা আঁতকে উঠলাম। কিন্তু না, বাইরের কেউ নয়, মাসুম। জামী টুক করে বস্তা দুটো তুলে ঘরে ঢুকে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ছাদের ঘরে। এতক্ষণে আমার হাত–পায়ে জোর ফিরে এসেছে, ধুকপুকুনির বদলে বুকে এখন উত্তেজনার জোয়ার। বললাম, 'বের কর তো, দেখি তোদের কীরকম অস্ত্র।' রুমী, কাজী বস্তা খুলে সাবধানে অস্ত্র বের করে জাজিমের ওপর রাখল। পাঁচটা স্টেনগান, একটা পিস্তল, দুটো হ্যান্ড গ্রেনেড। জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আমি, শরীফ, জামী, মাসুম–চারজনে হুমড়ি খেয়ে বসে অস্ত্রগুলো হাতে তুলে উল্টেপাল্টে দেখলাম, সেগুলোর গায়ে হাত বুলালাম, হ্যান্ড গ্রেনেড দুটোও একটু ছুঁয়ে দেখলাম। রুমীরা এগুলোকে বলে 'পাইন অ্যাপল– আনারস।' যতই আনারস বলুক, এগুলো মোটেই আনারসের মতো নিরীহ নয়।

আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম 'বল দেখি কী করে কী করলি–' কিন্তু শরীফ থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওসব পরে শুনব। এগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখব, তাই ঠিক করো আগে।'

অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক হল, নিচের উঠোনে পানির যে বিরাট হাউজটা আছে, সেটার ভেতরে একটা টুল বসিয়ে তার ওপর অস্ত্র রাখা হবে। হাউজটা চওড়ায় আট ফুট, লম্বায় দশ ফুট, উঁচুতে তিন ফুট। তার এ মাথার এক কোণে লোহার তৈরি গোল একটা ম্যানহোল, এইটে দিয়ে হাউজটার ভেতরে নামা যায়। হাউজটা এখন কানায় কানায় ভর্তি। আমাদের প্যান্ট্রিতে কয়েকটা টুল আছে, সেগুলো সোয়া দু ফুট উঁচু। হাউজের নিচের ট্যাপটা খুলে দেওয়া হল খানিকটা পানি বেরিয়ে যাবার জন্য। একটা টুল ভেতরে বসানো হল যেন তার বসার জায়গাটা পানির ওপর জেগে থাকে। জামী হাউজের ভেতর নেমে টুলটা দূরতম কোণে নিয়ে বসাল। অস্ত্রগুলো ছালা দুটোতে ভরে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঐ টুলের ওপর রাখা হল। যদি রাতে মিলিটারি আসেও, এই পানিভর্তি হাউজের ঢাকনা খুলে তাকায়ও, তাহলে টলটলে পানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। কারণ এখান থেকে উঁকি দিয়েও ওই কোনার টুল দেখা যায় না। টুল আবিষ্কার করতে হলে কাউকে হাউজের ভেতর নামতে হবে।

লেখক-পরিচিতি

জাহানারা ইমাম ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের সুন্দরপুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষিকা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও মুক্তিযোদ্ধা রুমীর মাতা হিসেবে, শহীদ–জননী নামেই তিনি অধিক পরিচিতি। একাত্তরে পাকিস্তানিদের দোসর ঘাতক–দালালদের নির্মূল করবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি 'বঙ্গ–জননী' আখ্যা পেয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'একাত্তরের দিনগুলি', 'ক্যান্সারের সাথে বসবাস', অন্যজীবন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৯৪ সালে আমেরিকায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রচনা-পরিচিতি

শহীদ–জননী জাহানারা ইমামের দিনপঞ্জিভিত্তিক বই 'একাত্তরের দিনগুলি' থেকে অংশবিশেষ এখানে সংকলন করা হয়েছে। একাত্তর সালে ২৫শে মার্চে পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ থেকে শুরু করে ধনী–দরিদ্র নির্বিশেষে সকল পরিবারের ছাত্র এবং নারীপুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কাহিনী এ রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। গেরিলাযোদ্ধা রুমীর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কথা ছাড়াও অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের এবং সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত অস্থায়ী হাসপাতালের বিবরণ এ লেখায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র–যুবকদের অংশগ্রহণের বিবরণ পড়ে শিক্ষার্থীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। স্বাধীনতাযুদ্ধে মায়েদের এবং মেয়েদের ভূমিকার পরিচয় পেয়ে তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে।

শব্দার্থ ও টীকা

জান্টা – জোর করে শাসনের অধিকার দখল করে রাখা চক্রান্তকারী দল।

গ্ল্যাডিয়েটার – প্রাচীন রোমের হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই করা যোদ্ধা।

কোরবানি – সব স্বত্ব ছেড়ে আল্লাহর নামে উৎসর্গ (এখানে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে)

গেরিলাবাহিনী – শত্রুপক্ষকে নানাভাবে হয়রান করে তোলবার জন্য গড়ে তোলা ছোট ছোট যোদ্ধাদল।

ব্রিগেড – সৈন্যবাহিনীর একটি বড় অংশ এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল।

নকশাল – ভারতের একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক দল।

অ্যামবুশ – অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওত পেতে থাকা।

বর্ডার– দেশের সীমান্ত।

আউটপোস্ট – আকস্মিক আক্রমণ ঠেকাবার জন্য মূল ঘাঁটি থেকে দূরের ছাউনি।

গজ–ব্যান্ডেজ – ক্ষতস্থান বাঁধবার স্বচ্ছ পাতলা কাপড়।

অপারেশন – সৈনিকদের যুদ্ধকালীন ক্রিয়াপ্রণালী।

পোর্চ – গাড়িবারান্দা।

বুট – গাড়ির পেছনের দিকে মাল রাখবার খোপ।

হ্যান্ড গ্রেনেড – হাতবোমা।

হাউজ – পানি সঞ্চয় করে রাখবার চৌবাচ্চা।

ম্যানহোল – ঢাকনাযুক্ত চৌবাচ্চা ইত্যাদিতে মানুষ ঢোকবার মতো মুখ বা প্রবেশপথ।

প্যান্ট্রি – ভাঁড়ার ঘর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একাত্তরে আমাদের জাতীয় জীবনে কোন বিশেষ ঘটনাটি ঘটেছিল?

ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. ভাষা আন্দোলন

গ. অসহযোগ আন্দোলন ঘ. গণঅভ্যুত্থান

২. রুমীদের বস্তায় কিছু অস্ত্র ছিল। যেমন–

i. স্টেনগান, মর্টার, গ্রেনেড

ii. স্টেনগান, রাইফেল, গ্রেনেড

iii. স্টেনগান, পিস্তল, গ্রেনেড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের ৩ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

'আম্মা, দেশের এরকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মতো অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়তো বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হব, কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনোদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না।'

৩. উদ্ধৃতাংশে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?

ক. মুক্তিযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তের খ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন

গ. বায়ান্নোর ফেব্রুয়ারির ঘ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. দেশপ্রেম খ. দায়িত্ববোধ

গ. সামাজিক মর্যাদা ঘ. যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা

৫. 'যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়তো যাব'–একথার অর্থ–

i. যাওয়াটা সমীচীন হবে না

ii. যেতে আপত্তি করবে না

iii. যাওয়ার প্রয়োজন নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii ও i

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

রুমী এসে ঢুকল ঘরে। রুমীর মুখভর্তি দাড়ি, চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, তামাটে গায়ের রং রোদে পুড়ে কালচে, দুই চোখে উজ্জ্বল ঝকঝকে দৃষ্টি, গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে ফুটে রয়েছে সেই ভুবন–ভোলানো হাসি।

ক. রুমি কোথায় গিয়েছিল?

খ. যুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে চেনা যেত?

গ. অনুচ্ছেদটির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কোন দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর।

ঘ. গায়ের রং রোদে পুড়ে কালচে–এ উক্তি মনে রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনচিত্র তুলে ধর।

জোঁক

আবু ইসহাক



সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরা পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম পেটে জামিন দেওয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কী?

ওসমান হুঁকা নিয়ে বসে আর মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল। হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছয় বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে–এই তেল মালিশ করলে কী অয় মা?

পানিতে কামড়াইতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

পানিতে কামড়ায়? পানির কি দাঁত আছে নি?

আছে না আবার। ওসমান হাসে। দাঁত না থাকলে কামড়ায় ক্যামনে?

টুনি হয়তো বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে–ঘাস,লতা–পাতা, কচু–ঘেঁচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতরে লাগলে কুটকুট করে। ওরেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুঁকা রেখে হাঁক দেয়– কই গেলি তোতা, তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভালো করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্ষের তেল। তারপর কাস্তে ও হুঁকা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে।

তেরোহাতি ডিঙিটাকে বেয়ে নিয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা।

দেখতে দেখতে পাটক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাট গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছে, লম্বাও হয়েছে প্রায় দুই মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে।

সে কি যেমন–তেমন খাটুনি! রোদ–বৃষ্টি মাথায় করে ক্ষেত চষো রে–ঢেলা ভাঙো রে–উড়া বাছো রে–তারপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোনো। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। 'বাছট' করে

–ফ্যান আনছছ দে–দে শিগগির।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশানো এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এজন্য স্ত্রীকেও সে ধন্যবাদ দেয় অব্যক্ত ভাষায়।

এরকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই বা আর তার বয়স : চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুনে গুনে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে–কী রানছেরে তোর মা?

–ট্যাংরা মাছ আর কলমি শাক।

–মাছ পাইল কই?

–বড়শি দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশি হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কানিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

–তোমার পায়ে কালা উইডা কি বাজান? তোতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে।

–কই?

–ওই যে, জোঁক না জানি কী। আঙুল দিয়ে দেখায় তোতা।

–জোঁকই ত রে। এইডা আবার কখন লাগল? শিগগির কাচিটা দে!

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জোঁক রক্ত খেয়ে ধুমসে হয়ে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোঁচ মারে সে। জোঁকটা দু টুকরো হয়ে যায়, রক্ত ঝরাতে ঝরাতে খসে পড়ে পা থেকে।

–আঃ বাঁচলাম রে। ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

–ইস, কত রক্ত। তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, –নে, এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাটবোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সেদিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান, কেমুন কইর‍্যা জোঁকে ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

– না রে বাজান। এগুলো কেমুন কইরা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে।

–জোঁকটা কত বড়, বাপ্পসরে–

–দুও বোকা। এইডা আর এমুন কী জোঁক। এর চেয়ে বড় জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেওয়া, কোষ্টা ছাড়ানো, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো। এসব কাজও কম মেহনতের নয়।

–ফ্যান আনছছ দে–দে শিগগির।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশানো এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এজন্য স্ত্রীকেও সে ধন্যবাদ দেয় অব্যক্ত ভাষায়।

এরকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই বা আর তার বয়স : চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুনে গুনে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে–কী রানছেরে তোর মা?

–ট্যাংরা মাছ আর কলমি শাক।

–মাছ পাইল কই?

–বড়শি দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশি হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কানিতে দুই হাতের ভর রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

–তোমার পায়ে কালা উইডা কি বাজান? তোতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে।

–কই?

–ওই যে, জোঁক না জানি কী। আঙুল দিয়ে দেখায় তোতা।

–জোঁকই ত রে। এইডা আবার কখন লাগল? শিগগির কাচিটা দে!

তোতা কাস্তেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত লোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরেই ধরেছে জোঁকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জোঁক রক্ত খেয়ে ধুমসে হয়ে উঠেছে।

ওসমান কাস্তেটা জোঁকের বুকের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জোঁকটা কাস্তের সাথে চেপে ধরে পোঁচ মারে সে। জোঁকটা দু টুকরো হয়ে যায়, রক্ত ঝরাতে ঝরাতে খসে পড়ে পা থেকে।

–আঃ বাঁচলাম রে। ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

–ইস, কত রক্ত। তোতা শিউরে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, –নে, এইবার লগি মার তাড়াতাড়ি।

তোতা পাটবোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জোঁক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। সেদিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান, কেমুন কইর‍্যা জোঁকে ধরল তোমারে, টের পাও নাই?

– না রে বাজান। এগুলো কেমুন কইরা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে।

–জোঁকটা কত বড়, বাপ্পসরে–

–দুও বোকা। এইডা আর এমুন কী জোঁক। এর চেয়ে বড় জোঁকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেওয়া, কোষ্টা ছাড়ানো, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো। এসব কাজও কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। এক জন কয়াল ও দাঁড়িপাল্লা সঙ্গে নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ির ঘাটে।

বাপ–বেটায় শুকনো পাট এনে রাখে উঠানে।

মেপে মেপে তিন ভাগ করে কয়াল।

গোমস্তা হাঁক দেয়– কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

– আরে মিয়া চাইয়া রইছ ক্যা? যাও।

– আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি?

– হ।

– ক্যা?

– ক্যা আবার।

– দুই ভাগ পামু।

– হ দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোড হুজুরের কাছে।

– হ এহনই যাইমু।

– আইচ্ছা যাইও যখন ইচ্ছা। এহন পাট দুই ভাগ আমায় নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

– না দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

– আরে আমার লগে রাগ করলে কী অইব, যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কয়েন, তহন না হয় ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানার বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

–হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

– কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

– হুজুর, তিন ভাগ কইর‍্যা এক ভাগ দিছে আমারে।

– হ্যাঁ, ঠিকই ত দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

–বুঝতে পারলে না? লাঙল–গরু কেনার জন্য টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশ।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

–আমি টাকা নিছি! কবে নিলাম হুজুর?

–হ্যাঁ, এখন ত মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু–লাঙল কেনার টাকা দিয়েছি। এজন্য আমরা পাব দু দু ভাগ, তোমরা পাবে এক ভাগ।

–আমি টাকা নিই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য করব না।

–যা যা ব্যাটা, বেরো, বেশি তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমিও দেব না কোনো ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে, –বাজান কেমুন কইরা লেইখ্যা রাখছিল; টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়–আহা–হা–রে।

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনও দেখেনি।

চৌধুরী বাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে–করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরও দশ বারোজন চাষী এদিকেই আসছে। করিম গাজী ডাক দেয়– কী মিয়া শেখের পো, যাও কই।

–গেছিলাম এই বড় বাড়ি। ওসমান উত্তর দেয়–আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে এক্কেবারে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশ–

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে– ও, তুমিও টিপ দিছিলা কাগজে?

–হ ভাই, কেমন কইর‍্যা যে কলমের খোঁচায় কী লেইখ্যা থুইছিল, কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমনডা অয়! টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল– জমি বর্গা নিবা তার একটা দলিল থাকা ত দরকার।

–হ, বেবাক মানুষেরেই এমবায় ঠকাইছে।

করিম গাজী বলে– আরে মিয়া এমন কারবারডা অইল আর তুমি ফিরা চলছ?

–কী করমু তয়?

– কী করবা, খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী। –চল আমাগ লগে, দেহি কী করতে পারি।

ওসমান দেখে এদের সকলের হাতে লাঠি।

করিম গাজী তাড়া দেয়– কী মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যা? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু?

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই বাড়ি যা গা।

তার ঝিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে বলে– হ চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

লেখক-পরিচিতি

আবু ইসহাক ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে শরিয়তপুর জেলার শিরঙ্গাল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে আই এ পাস করার পরেই তিনি সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। এরপর করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬০ সালে বি.এ পাস করেন।

আবু ইসহাক এক জন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তিনি খুব বেশি সংখ্যক গ্রন্থ রচনা না করলেও সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছেন। এদেশের সামাজিক সমস্যা ও গ্রাম জীবনের ছবি তাঁর গল্পে খুব সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

উপন্যাস–সূর্যদীঘল বাড়ি, পদ্মার পলিদ্বীপ।

গল্পগ্রন্থ : হারেম, মহাপতঙ্গ।

আবু ইসহাক ১৯৬০ সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

উদরপূর্তি – পেট ভরানো।
দুর্মূল্য – খুব বেশি দাম।
রয়নার তেল – রয়না গাছের বীজ থেকে যে তেল হয়।
ডিব্বা – কৌটা।
মালশা – মাটির পাত্র।
তেরোহাতি – তেরো হাত লম্বা।
তৃপ্তি – সন্তোষ, আনন্দ।
ঢেলা – মাটির খণ্ড।
টিঙটিঙে – শীর্ণ, খুব পাতলা।
গোমস্তা – খাজনা আদায়কারী কর্মচারী।
আহিডা – আসাটা।
তেলোয় – তালুতে।
গতরে – গায়ে।
মেহনত – পরিশ্রম।
লোহারু – কামার।
থাবড়া দিয়া – থাবা দিয়ে।
খোয়া – ইট–পাথরের বড় কুচি।
করাতে জোঁক – এক ধরনের বিষাক্ত জোঁক– যার দাঁত করাতের মতো।
কয়াল – যে ওজন করে।

করায় গণ্ডায় – পুরোপুরি।
বাইনের সময়– জমি চাষ ও বপনের সময়।
ইস্কুলতন – স্কুল থেকে।
শুকুর আলহামদুলিল্লাহ–সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত।
বিলিব্যবস্থা – এখানে চাষের জন্য চাষিদের কাছে জমি বিতরণের ব্যবস্থা করা।
বেবাক – সব।
এমবায় – এমনিভাবে।
অজম – হজম।
উডা – খেতের আবর্জনা।
কোস্টা – গাছের পাট।
বাছট – দুর্বল গাছ বেছে ফেলা।
আল – কাস্তের খাঁজ।

ভাষার কাজ

এই পাঠে অনেকগুলো আঞ্চলিক শব্দের ব্যহার হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হই : ব্যাডা (ব্যক্তি), এক্কেরে (একেবারে), নায় (নৌকায়), টাঙনা (ঝোলানো), খাম খাম (খাব খাব), উইডা (ওটা), লগি (আলগা বাঁশ যা দিয়ে নৌকা ঠেলা হয়), বেবাক (সব), আমাগ লগে (আমাদের সঙ্গে)।

পাঠ-পরিচিতি

'জোঁক' গল্পটি লেখকের 'মহাপতঙ্গ' গল্পগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গল্পটির মধ্যে সামাজিক জীবনের অন্যায় ও অবিচারের প্রতি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে শোষিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিও ব্যক্ত হয়েছে। এ গল্পে লেখাপড়া না জানার কুফলের কথাও বলা হয়েছে। গরিব বর্গাচাষি ওসমান। বহু কষ্টে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরের জমিতে ফসল ফলায় সে। কিন্তু ফসলের পুরোপুরি অংশ তার প্রাপ্য নয়। ফসলের অর্ধেক সে পায়। কিন্তু এত কষ্টের ফসল সে সবটুকু পায় না বলে তার দুঃখের অন্ত নেই। সে খেতমজুর, খেতের মালিক নয়। খেতের মালিক খেতের কাছে না গিয়েও তাকে নানা কৌশলে ঠকিয়ে ফসলের সিংহভাগ কেড়ে নেন। এই মালিকেরা যেন জোঁকের মতো–ই রক্তচোষা– গরিব চাষির রক্ত চুষে এরা ফুলেফেঁপে ওঠে। কিন্তু এ শোষণ দীর্ঘদিন চলতে পারে না। চাষিরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তারা এক দিন সংঘবদ্ধ হয়। তারা রুখে দাঁড়ায় শোষক জোতদারের বিরুদ্ধে। সমাজ থেকে এসব জোঁক অবশ্যই দূর করতে হবে।

অধিকার আদায় আর অন্যায়ের প্রতিবাদে বঞ্চিত মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী চাষিদের জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

শিক্ষার্থীর মনে শোষিত মানুষের প্রতি সমবেদনা জাগবে। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উচ্চকিত হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোন গ্রন্থটি আবু ইসহাকের রচিত?
   ক. তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত   খ. তিতাস একটি নদীর নাম
   গ. পদ্মার পলিদ্বীপ   ঘ. পদ্মানদীর মাঝি

২. 'ব্যাডারে একদিন পচা পানির কামড় খাওয়াইতে পারতাম।'–কথাটি ওসমান কেন বলেছে?
   ক. মালিক ওসমানকে ঘৃণা করে   খ. ওসমান মালিককে ঈর্ষা করে
   গ. ওসমানের শ্রমের কষ্ট থেকে   ঘ. মালিক তোতাকে মেরেছে বলে

৩. গল্পে 'এক্করে' শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক.	ওখানে	খ.	একেবারে
গ.	সবখানে	ঘ.	এখানে

৪. 'আহ-হা-রে।' ওসমানের এ দীর্ঘশ্বাস কেন?

ক.	না বুঝে টিপসই দিয়ে	খ.	পাটের একভাগ পেয়ে
গ.	খেতে না পেয়ে	ঘ.	পানির কামড় খেয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

এগুলো কেমুন কইরা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে। –জোঁকটা কত বড়, বাপ্পসরে–দুও বোকা। এইডা আর এমুন কী জোঁক। এর চেয়ে বড় জোঁকও আছে। জমি থেকে পাট কেটে ফেলার পরও ঝামেলা পোহাতে হয় অনেক। জাগ দেওয়া, কোষ্টা ছাড়ানো, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো। এসব কাজও কম মেহেনতের নয়। [.......] গোমস্তা হাঁক দেয়–কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ক. ওসমানের আবাদকৃত পাট কত ভাগ করা হয়েছিল?
খ. 'টের পাইলে কি আর রক্ত খাইতে পারে।'–বুঝিয়ে লেখ।
গ. উদ্ধৃতির অংশে বর্গাচাষে যে বঞ্চনার কথা আছে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'দুও বোকা। এইডা আর এমুন কি জোঁক। এর চেয়ে বড় জোঁকও আছে।'–কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

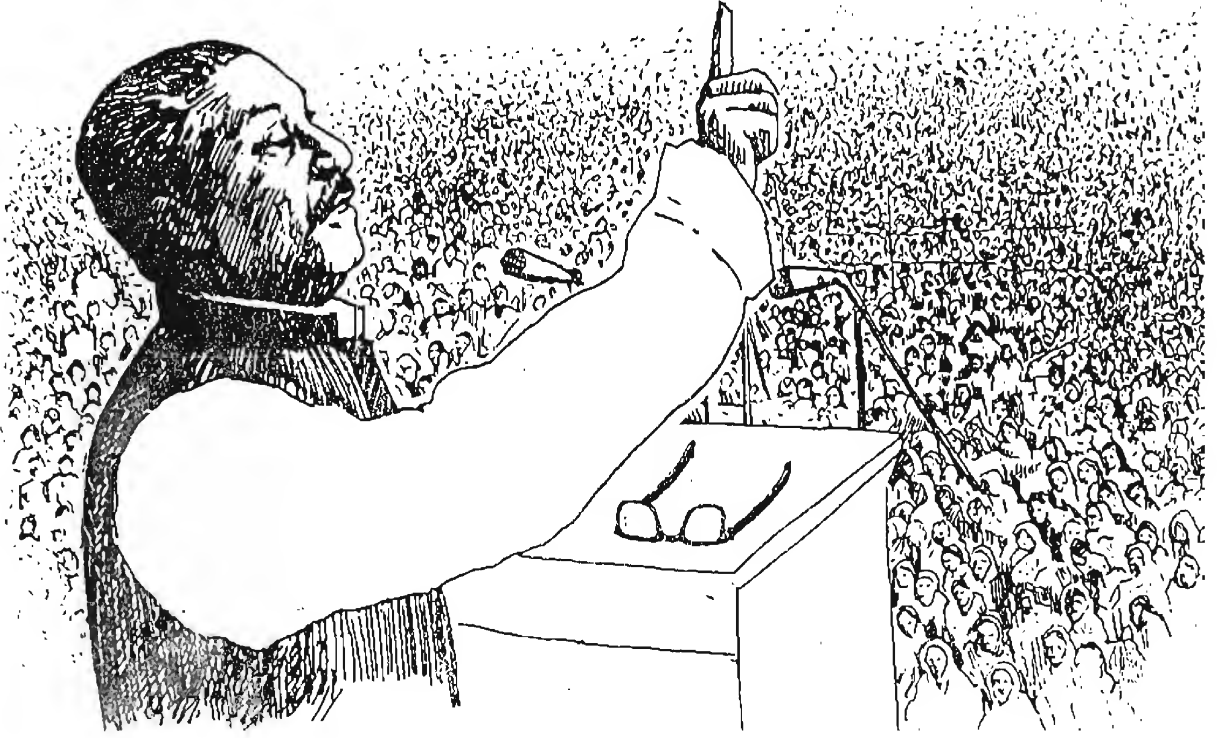
২. **অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

হ, বেবাক মানুষেরই এমবায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে–আরে মিয়া এমন কারবারডা অইল আর তুমি ফিরা চলছ?
– কী করমু তয়?
– কী করবা, খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী।–চল আমাগ লগে, দেহি কী করতে পারি। ওসমান দেখে এদের সকলের হাতে লাঠি।...একটা কিছু না কইর‍্যা ছাইড়্যা দিমু?
তার ঝিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে বলে–হ চল। রক্ত চুইষ্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

ক. দলিলে টিপসই দিয়ে ওসমান কত টাকার প্রতারণার শিকার হল?
খ. করিম গাজী ওসমানকে কেন উদ্বুদ্ধ করল?–ব্যাখ্যা কর।
গ. জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে বর্গাচাষিদের প্রতিবাদ কতটুকু সংগত বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর।
ঘ. 'অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

শেখ মুজিবুর রহমান



[**পূর্বকথা** : ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্রের ধারা অনুসারে পাকিস্তানের শাসনভার পাওয়ার কথা আওয়ামী লীগের অর্থাৎ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ এর ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডেকেছিলেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মার্চ এক ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা শুনেই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' ইত্যাদি স্লোগানে শহর বন্দর গ্রাম আন্দোলিত হয়।

এই পটভূমিতেই ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের ঐ ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। আবেগে, বক্তব্যে, দিক নির্দেশনায় ঐ ভাষণটি ছিল অনবদ্য। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণটিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঐতিহাসিক ভাষণটি এখানে লিপিবদ্ধ হল।]

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল–ল জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন–গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে– মার্চ মাসে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসব। এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল, দোষ দেওয়া হল বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। কী পেলাম আমরা? আমরা আমাদের পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গবির-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু–আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর.টি.সি–তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল–ল উইথ্‌ড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরৎ যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশের কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে–শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু–আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি চালাবার চেষ্টা কোরো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়া রাখতে পারবে না।

সরকারি কর্মচারীদের বলি, যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল–কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু পেছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়–হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশআল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

লেখক পরিচিতি

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সাহেরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতি ও দেশব্রতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ৬ দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকালে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরেন এবং সরকার গঠন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার মহান দায়িত্বে ব্রতী হন। তাঁর সরকারই বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে গেছেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।

শব্দার্থ ও টীকা

নির্বাচনের পর – ১৯৭০–এ অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব–পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

শাসনতন্ত্র – রাষ্ট্র পরিচালনার অনুশাসন ও বিধানসমূহ। সংবিধান।

ন্যাশনাল এসেমব্লি – জাতীয় পরিষদ।

ভুট্টো সাহেব – পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির তৎকালীন নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালি যেন পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেতে না পারে সে জন্যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

আর.টি.সি – রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স। গোল টেবিল বৈঠক। সমস্যা সমাধানের কথা বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করলেও ভেতরে ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

মার্শাল-ল – সামরিক আইন। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক শাসন চালু রাখা হয়।

উইথড্র – প্রত্যাহার।

ব্যারাক – সেনাছাউনি।

সেক্রেটারিয়েট – রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশাসনিক কেন্দ্র। সচিবালয়।

সুপ্রিম কোর্ট – সর্বোচ্চ আদালত।

হাই কোর্ট – উচ্চ আদালত।

জজ কোর্ট – জেলা আদালত।

সেমি-গভর্নমেন্ট – আধা-সরকারি।

ওয়াপদা – ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

পাঠ-পরিচিতি

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঙ্কুশ বিজয়; তবুও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭ই মার্চ ১৯৭১–এ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় দশ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণ ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিখ্যাত।

পাঠের উদ্দেশ্য

রচনাটি পাঠ করলে স্বাধীন বাঙালি জাতি ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম, অবদান এবং বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কথা জানতে পারবে। এই রচনা পড়ে শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আয়ুব খানের পতনের পর কে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

ক. ইয়াহিয়া খান খ. জুলফিকার আলী ভুট্টো
গ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. মওলানা ভাসানী

২. আমাদের পয়সা দিয়ে কেনা অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে–

i. দেশ রক্ষার জন্য।
ii. নিরস্ত্র মানুষের ওপর।
iii. সংগ্রামী জনতার ওপর।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. বঙ্গবন্ধু আহ্বান করেছিলেন–

i. ঘরে ঘরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে।

ii. যার যা আছে তা দিয়েই শত্রু মোকাবেলা করতে।

iii. সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. ৭ই মার্চের ভাষণই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। কেননা, এই ভাষণ–

ক. আজো স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

খ. স্বাধীনতার আহ্বান সংবলিত।

গ. সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

ঘ. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি অসহযোগের আহ্বান।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ষাটোর্ধ্ব মোস্তফা সাহেব গর্ব করে বলেন, ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের সময় তিনি রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত ছিলেন, দেখেছিলেন লাখ লাখ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েত। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সবাই ছিলেন উদ্বেলিত। এ ভাষণ– তার মতো লাখো বাঙালিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল স্বাধীন মানচিত্রের।

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?

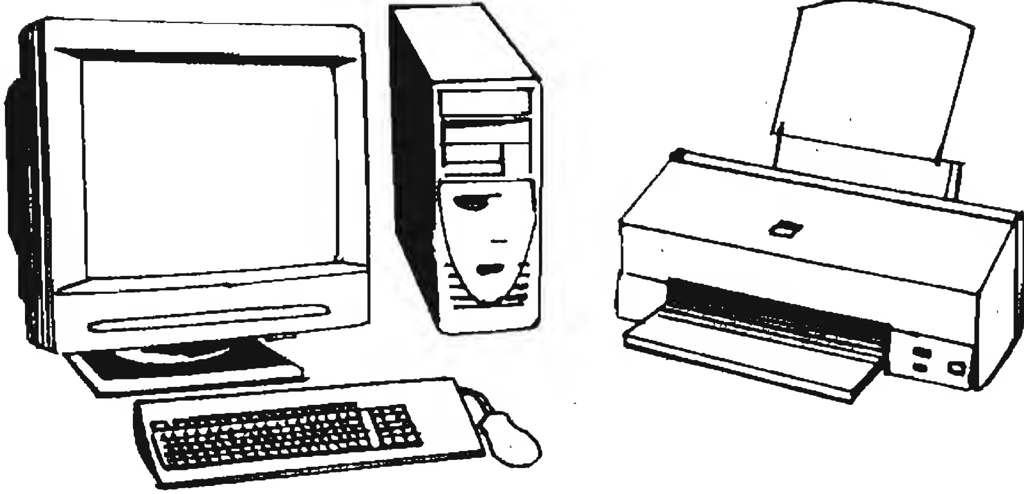
খ. বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটিকে ‘ঐতিহাসিক ভাষণ’ বলার অন্যতম একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এ ভাষণে কোন ধরনের সংগ্রামের জন্য জাতিকে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন তা বর্ণনা কর।

ঘ. “বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণটি নানা ঐতিহাসিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি”–বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

কম্পিউটারের কথা

এ. এম. হারুনর রশীদ



আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন বিজ্ঞান মানুষের জীবন সহজ আর স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য অসংখ্য উপহার দিয়েছে। এরকম এক অনবদ্য উপহার হল কম্পিউটার (বা গণনাযন্ত্র)। আজকাল কম্পিউটার দিয়ে এমন সব কাজ করা সম্ভব হয়েছে যা কিছুদিন আগে পর্যন্ত কল্পনাও করা যেত না। যেমন এই সেদিন মানুষ চাঁদে গিয়ে পাথরের টুকরো নিয়ে এসেছে। এমনকি হ্যালির ধূমকেতুর খুব কাছ থেকে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাও পাঠানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহাকাশযান ভয়েজারের নাম আমরা সকলেই শুনেছি। মানুষের তৈরি এই মহাকাশযান বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস গ্রহের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়েছে।

এ সবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার যন্ত্রের অভাবিত উন্নতির ফলে। কম্পিউটারের নিখুঁতভাবে গণনা করা যায় বলেই মহাশূন্যে মহাকাশযানের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানুষ যদি কোনো দিন অন্য গ্রহ বা অন্য তারায় গিয়ে বাস করতে চায় তাহলে কম্পিউটার ছাড়া তা মোটেই সম্ভব হবে না।

তবে দৈনন্দিন জীবনেও কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। আজকাল বেতন বা আয়করের হিসাব, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল এ সবই কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। ব্যাংকে কোটি কোটি টাকার হিসাব রাখা হয় কম্পিউটার দিয়ে। এমনকি নির্ভুল চিঠি লেখা, বই অথবা খবরের কাগজ ছাপানো– এসব কাজও কম্পিউটার দিয়ে করা হয়। একটা বিশাল অট্টালিকা বা সেতু তৈরি করার কাজেও কম্পিউটারের ব্যবহার খুবই দরকারি।

আধুনিক জীবনের সর্বত্র এমনি প্রয়োজনীয় কম্পিউটার আসলে মানুষেরই তৈরি একটা যন্ত্র। এ যন্ত্রের কাজ হল খুব তাড়াতাড়ি হিসেব করে নিমিষে জটিল গণনার কাজটি করে দেওয়া। শুধু তাই নয়। অনেক কিছু তথ্য আমরা কম্পিউটারের স্মৃতিতে জমা করে রাখতে চাই যাতে প্রয়োজনমতো সেগুলো ব্যবহার করতে পারি। কম্পিউটার এ কাজটা খুব ভালোভাবে করতে পারে।

'তথ্য' বলতে আমরা কী বুঝি? ধরা যাক, কোনো এক স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর নাম, অভিভাবকের নাম, জন্ম-তারিখ, উচ্চতা, ওজন, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি সব কিছু আমরা জমা করে রাখতে চাই। এ সবই হল ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য।

এসব তথ্য আমাদের নানা কাজে সব সময়ই দরকার হয়। যেমন আমরা জানতে চাই যে–কোনো স্কুল থেকে গত দশ বছরে কত জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় শতকরা ষাট নম্বর বা তার বেশি পেয়েছে। হাতে গুনে এ সংখ্যা বের করতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু কম্পিউটারে প্রতি বছর স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল জমা করে রাখলে খুব অল্প সময়ে ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। পরীক্ষার সার্টিফিকেট হারিয়ে গেলেও ভয় নেই, কম্পিউটার যে–কোনো সময়ে সার্টিফিকেট না দিতে পারুক, কোন পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছে তা বলে দিতে পারবে।

কম্পিউটারের ব্যবহারকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। ব্যবসায়িক আর বৈজ্ঞানিক। ব্যবসায়িক কাজে রয়েছে কেনা–বেচার হিসাব, কর্মচারীদের বেতন, বিল, সুদ কষা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক কাজে কম্পিউটারের প্রধান ভূমিকা হল গবেষণায় সাহায্য করা। যেমন পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম পরীক্ষা আজকাল পুরোপুরি কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জটিল পরীক্ষার ফলও বিশ্লেষণ করা হয় শক্তিশালী কম্পিউটারের সাহায্যে। আজকাল বিনোদনের জন্যও কম্পিউটার অনেকভাবে ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক কম্পিউটার–যন্ত্রের জনক হিসেবে অবশ্য চার্লস ব্যাবেজকেই আমরা স্মরণ করে থাকি। ১৮২২ সালে ব্যাবেজ (১৭৯২–১৮৭১) ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি অনুদান পেয়েছিলেন। তাঁকে একটি 'ডিফারেন্স এঞ্জিন' বা বিয়োগ করার যন্ত্র তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সংখ্যার ঘাত গণনা করা অর্থাৎ যে–কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে এক বার, দু বার, তিন বার, চার বার ইত্যাদি বিভিন্ন বার গুণ করলে যে ফল হয় তা বের করা। এ কাজের জন্য ব্যাবেজ একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, বিয়োগযন্ত্র তৈরি করার সময়েই তিনি আর একটি নতুন যন্ত্র তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই দ্বিতীয় যন্ত্রটি তিনি তৈরি করে যেতে পারেননি, কিন্তু তাঁর এই না–বানানো যন্ত্রই তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। যন্ত্রটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'এনালিটিকাল এঞ্জিন' বা বিশ্লেষণী যন্ত্র।

আসলে ব্যাবেজ ছিলেন মূলত এক জন তাত্ত্বিক। ধনী ব্যাংক ব্যবসায়ীর পুত্রের পক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশাল সম্পত্তি বিজ্ঞানের উন্নতির কাজে লাগানোর কোন অসুবিধা ছিল না। স্কুল কলেজে তিনি নিয়মিতভাবে লেখাপড়া করেন নি। কিন্তু তবু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয় নি। কেম্ব্রিজে তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে গণিতে তাঁর জ্ঞান তাঁর শিক্ষকদের চেয়ে বেশি।

চার্লস ব্যাবেজ যে বিশ্লেষণী যন্ত্রের কল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারের অনেক গুণই উপস্থিত ছিল। আধুনিক কম্পিউটারের স্মৃতির মতোই পঞ্চাশ সংখ্যাবিশিষ্ট এক হাজার রাশি জমা রাখার ব্যবস্থা তিনি চিন্তা করেছিলেন। ছিদ্র–করা কার্ডের সাহায্যে তথ্য আদান–প্রদানের ব্যবস্থাও করা যেত। এমনকি এ ধরনের কার্ডের মাধ্যমে গণণার সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলি যন্ত্রের মাধ্যমে আগেই রাখার কথাও চিন্তা করা হয়েছিল।

ব্যাবেজের সময়ে এত জটিল যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর অসমসাহসিক নকশার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তবু সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে, ব্যাবেজের অনেক ধ্যান–ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লেডি লাভলেস বা আডা বাইরন। আডা হলেন বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বাইরনের কন্যা, আর ব্যাবেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আডা বাইরন বিশ্লেষণী যন্ত্রের অনেক কর্মসূচি বা প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলেন। তাই তাঁকে পৃথিবীর প্রথম প্রোগ্রামার বলা হয়।

আধুনিক কম্পিউটার–যন্ত্রে প্রোগ্রাম একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কোনো গণনার কাজে যোগ–বিয়োগ গুণ–ভাগ বা অন্যান্য হিসাব যা যা দরকার তার সকল বিস্তারিত নির্দেশমালাই হল প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি। যন্ত্রকে এসব নির্দেশ দেওয়ার পর মানুষের হাতে আর কিছুই করার দরকার হয় না।

লেখক-পরিচিতি

এ.এম. হারুনর রশীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের 'বোস অধ্যাপক' ছিলেন। ১৯৩৩ সালে বরিশালে তাঁর জন্ম। বিজ্ঞানবিষয়ক লেখা তাঁর বিভিন্ন বই রয়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গেও তিনি নানাভাবে সম্পৃক্ত। এদেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, আকাশ ভরা সূর্য–তারা, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, উপমহাদেশের কয়েক জন বিজ্ঞানী ও কম্পিউটারের কাহিনী।

শব্দার্থ ও টীকা

স্বাচ্ছন্দ্যময় – বাধাহীন, স্বচ্ছন্দভাব, স্বাভাবিক।

অট্টালিকা – দালান।

হ্যালির ধূমকেতু – ধূমকেতু এক ধরনের জ্যোতিষ্ক যা সূর্যের চারদিকে ঘোরে। বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যালি যে ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন, তার নাম হ্যালির ধূমকেতু। এই ধূমকেতু পঁচাত্তর বছর পর পর দেখা যায়।

মহাকাশ যান – মহাকাশে গমনকারী বাহন, নভোযান।

নিয়ন্ত্রণ – আয়ত্তে রাখা।

জনক – জন্মদাতা।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় – ইংল্যান্ডের কেম্ব্রিজ শহরে স্থাপিত বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বয়ংক্রিয় – যা নিজে নিজে কাজ করে।

নিদর্শন – চিহ্ন, প্রমাণ।

বিমূর্ত – যার কোনো রূপ নেই, ভাবমূলক।

গতিপথ – চলার পথ।

পাঠ-পরিচিতি

‘কম্পিউটারের কথা’ প্রবন্ধটি লেখকের ‘কম্পিউটারের কাহিনী’ গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময়কর অবদান কম্পিউটার। কম্পিউটারের দু রকম ব্যবহার রয়েছে : ব্যবসায়িক ও বৈজ্ঞানিক। আধুনিক কম্পিউটার–যন্ত্রের জনক হচ্ছেন চার্লস ব্যাবেজ। কম্পিউটার যন্ত্রে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে এর প্রোগ্রাম। কম্পিউটার আবিষ্কার মানুষের কাজ সহজ করেছে, বয়ে এনেছে সীমাহীন কল্যাণ।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী কম্পিউটার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করবে। কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কম্পিউটারের অন্যতম প্রধান কাজ কোনটি?

ক. নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা খ. গ্রহের তথ্য সংগ্রহ করা
গ. টেলিফোন তৈরি করা ঘ. নির্ভুল চিঠি লেখা

২. কম্পিউটারের ফলে মানুষের জীবন সহজ আর স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠেছে। কারণ–কম্পিউটার

ক. বিশাল তথ্য সংরক্ষণ করছে খ. বিরাট বিরাট অঙ্ক নির্ভুলভাবে করে দিচ্ছে
গ. বহুমুখী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ঘ. অফিস পরিচালনায় সাহায্য করছে

অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এ সবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার যন্ত্রের অভাবিত উন্নতির ফলে। কম্পিউটারে নিখুঁতভাবে গণনা করা যায় বলেই মহাশূন্যে মহাকাশযানের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানুষ যদি কোনো দিন অন্য গ্রহ বা তারায় গিয়ে বাস করতে চায় তাহলে কম্পিউটার ছাড়া তা মোটেই সম্ভব হবে না।

১. প্রাথমিক অবস্থায় কম্পিউটারের প্রধান কাজ কী ছিল?

ক. ডাটা সংরক্ষণ
খ. গণনাকরণ
গ. তথ্য প্রণয়ন
ঘ. ছবি তোলা

২. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশিত হয়েছে কম্পিউটারের–

ক. গুরুত্ব
খ. সাফল্য
গ. উন্নতি
ঘ. গৌরব

৩. কম্পিউটারের সাহায্যে মহাশূন্যে মহাকাশযানের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়–এ কথার অর্থ–

i. কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণে দক্ষ
ii. কম্পিউটার নিখুঁত গণনায় দক্ষ
iii. কম্পিউটার ভারসাম্য রক্ষায় দক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:**

তবে দৈনন্দিন জীবনেও কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। আজকাল বেতন বা আয়করের হিসাব, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, এ সবই কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। ব্যাংকে কোটি কোটি টাকার হিসাব রাখা হয় কম্পিউটার দিয়ে। এমনকি নির্ভুল চিঠি লেখা, বই অথবা খবরের কাগজ ছাপানো এসব কাজও কম্পিউটার দিয়ে করা হয়। একটা বিশাল অট্টালিকা বা সেতু তৈরি করার কাজেও কম্পিউটার খুবই দরকারি।

ক. অংশটি কোন গদ্যাংশ থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ. বর্তমান জীবনে কম্পিউটারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় কেন?

গ. উদ্ধৃতিটির আলোকে তোমার ব্যক্তিজীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার লেখ।

ঘ. উদ্ধৃতিটিতে কম্পিউটার ব্যবহারের যে পরিচয় আছে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃত অংশটির আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মোটামুটি কম্পিউটারের ব্যবহারকে দু ভাগে ভাগ করা যায়: ব্যবসায়িক আর বৈজ্ঞানিক। ব্যবসায়িক কাজে রয়েছে কেনা–বেচার হিসাব, কর্মচারীদের বেতন, বিল, সুদ–কষা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক কাজে কম্পিউটারের প্রধান ভূমিকা হল গবেষণায় সাহায্য করা। যেমন পদার্থবিজ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম পরীক্ষা আজকাল পুরোপুরি কম্পিউটার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ক. কম্পিউটার শব্দের অর্থ কী?

খ. কম্পিউটার কীভাবে আমাদের ব্যবসায়িক জীবনকে প্রভাবিত করে তুলেছে?

গ. একটি রোগ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে লেখ।

ঘ. কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

ফুলের মেলা

মুহম্মদ আবদুল হাই



ইংল্যান্ডের বসন্তকাল কিন্তু ভিন্ন ধরনের; মার্চ মাস শেষ হতে না হতেই তরুলতায় পাতার মুকুল দেখতে পেলাম। আজ এ গাছে চাই ত দেখি, যেখানে যতটুকু পাতা বোরোনো সম্ভব তাতেই অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছে। কাল যদি খেয়াল করি ত আরও বেড়ে গেছে। পরের দিন দেখি আরও। এমনি করে সপ্তাহ কি পক্ষকালের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে শীতের প্রকোপে নিষ্প্রাণ তরুলতায় অকস্মাৎ এক দিন প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখলাম। মৃতের মধ্যে জীবন কী করে সঞ্চারিত হয় আর প্রকৃতিতে সে জীবন কী করে তরঙ্গায়িত হয়, ইংল্যান্ডের ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। সন্ধ্যায় এক রকম দেখি ত সকালে অন্য রকম। আরও সুন্দর, আরও ভালো। প্রকৃতির যেদিকে চাই, সেদিকেই দেখি যেন সুন্দরের আগুন লেগে গেছে।

ছোট ছোট গাছে পাতা নেই। শুধু ফুল। অনাবিল সৌন্দর্যের এই খেলা দেখবার জন্য এখানকার পার্কগুলোয় রাশি রাশি টাকা খরচ করা হচ্ছে। ডালপালায় হাত-পা মেলে দেওয়া আমাদের মাথাসমান উঁচু ফুলের গাছ। সারি সারি সাজানো। কতকগুলোতে শুধু সাদা ফুল। কতকগুলোতে লাল, নীল, হলদে, বেগুনি। ভারি ভালো লাগে তার নিচে গিয়ে দাঁড়াতে। রিজেন্ট পার্ক আমার বাসার কাছ থেকে মিনিট তিনেকের পথ। প্রাকৃতিক শিল্প-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এটি লন্ডনের একটি সেরা পার্ক। এ পার্কের গোলাপের বাগানের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বাগানটি রানী মেরির নামের সঙ্গে জড়ানো। জুন, জুলাই- এ দু মাস গোলাপ ফুলের। সম্রাজ্ঞী মেরির গোলাপোদ্যানের গোলাপেরা কেউ ফুটছে, কেউ কেউ বা ফুটে রৌদ্রে স্নানরত নরনারীর চোখ জুড়াচ্ছে, মন ভোলাচ্ছে। নানা রঙের এত গোলাপ একসঙ্গে পাশাপাশি এত করে ফুটতে দেখলে নিতান্ত অরসিকের প্রাণও রসোচ্ছল হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কী? রোদে ভরা ছুটির দিনগুলোতে রিজেন্ট পার্ক ও কিউ গার্ডেনে এখানকার মালীদের হাতে গড়া গোলাপের বিচিত্র শোভা দেখে দেখে মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। অপরিমেয় ফুলের রঙে চোখে লাগছে নেশা।

বসন্ত ও গ্রীষ্মের এক এক মাসে এক এক রকম ফুল এখানকার বৈশিষ্ট্য। আবার একই ফুলের কত বৈচিত্র্য তা বলে শেষ করা যায় না। এপ্রিল মাসে দেখলাম লাইলাক ফুলে রিজেন্ট পার্ক ছেয়ে গেছে। বেগুনি আর আসমানি রঙের লাইলাক। কবি এলিয়টের বড় প্রিয় ফুল।

মৃত্যুর ভেতর থেকে জীবনের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে বলে কবি লাইলাককে বলেছেন জীবনের সঞ্জীবনী। আমারও লাইলাক ভালো লাগল। তার কারণ ইংল্যান্ডের এত ফুলের মধ্যে শুধু লাইলাকেই গন্ধ পেলাম।

মে মাস হল টিউলিপ, উইলো, মে'জ ব্লসম, চেস্টনাট আর ডেইজির। টিউলিপ আমাদের দেশের ধুতুরা ফুলের মতো। কেবল ফুলটুকু ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে ওর সাদৃশ্য আঁকা যাবে না। পাতার সঙ্গে নয়, পাপড়ি বা দল কিছুরই সঙ্গে নয়। বাইরের দিকে ধুতুরা ফুলের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, এতটুকু বলা যায়। আকারে টিউলিপ ধুতুরা ফুলের চেয়ে অনেক ছোট। বলিহারি যাই টিউলিপের রং দেখে। কোনো জায়গায় দুধের চেয়ে সাদা, কোনো জায়গায় রক্তের চেয়ে লাল। কোনোটায় বেগুনি। কোনোটায় জাফরানি। কোনোটায় ধুপছায়া। কোনোটায় দুধে আলতা মাখানো। কোনোটা হলুদ। কোনোটায় থাকে প্রজাপতির গায়ের রেখাটানা বিচিত্র রঙের কারুচিত্র, থাকের পরে থাক, টিউলিপে টিউলিপময়। ইংরেজ জাত শুধু নিজেদের স্বাস্থ্য সাম্রাজ্যেরই চর্চা করেনি, প্রকৃতিকে মুঠোর মধ্যে বন্দি করে তৃপ্তি পাবার অপরূপ ব্যবস্থাও করে রেখেছে। ফুলের যে এরা কী ভক্ত এবং ফুলের রঙে যে এদের কী আনন্দ, এ থেকে একথাই বারবার মনে পড়ে।

মে'জ ব্লসম মে মাসের খাস ফুল। গাছগুলো আমাদের দেশের মেহেদি গাছের মতো। কোনোটা কিছুটা বড়। কোনোটা বা ছোট। ঝনুঝনে গাছে পাতার সাথে যেমন একহারা হলুদ ফুল লেগে থাকে, তেমনি মে'জ ব্লসম ফুলের রূপ। এ ফুলের চমৎকার রং বেশ চোখে লাগার মতো।

বাকি রইল চেস্টনাট আর ডেইজি। বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের দিক থেকে দুটি দুই প্রান্তে। চেস্টনাট কাঠবাদামের গাছ। পার্কগুলোতে সুদক্ষ শিল্পীর প্লানমতো সারি সারি যে কত দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শেষ নেই। শীতকালে যেভাবে এরা শুকিয়েছিলো, আমাদের দেশে হলে বেশ ভালো জ্বালানি হত। কিন্তু বসন্ত আসতে না আসতে প্রকাণ্ড চেস্টনাট গাছের পাতায় পার্কগুলো ছায়া-সুনিবিড় হয়ে উঠল। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কাশফুলের মতো শিষ মাথায় নিয়ে তাদের শ্বেতফুল বাতাসের ভারে থরে থরে কাঁপছে। একেই বলে জীবনের জাগরণ। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড গাছও স্নিগ্ধতায় ও সৌন্দর্যে মাথায় একরাশ ফুল নিয়ে মনোরম হতে চাইছে।

মাটিতে যদি চাইছি-দেখছি ঘাসেও ফুল। অবিমিশ্র ঘাস কোথাও নেই। শিশিরবিন্দুর মতো ফুলের অনন্ত শ্বেতকণিকা ঘাসের মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছে। সবার পিছে, সবার নিচে সর্বহারাদের মাঝে ঘাস এখানে ছোট হয়ে নেই। সবার আনন্দের ভাগ সেও যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্য তারও বুক ফুলে ভরে রয়েছে। এই ঘাসফুলের অণু পরমাণুগুলোর নাম ডেইজি। আর মেয়েদের কানফুলের মতো যেগুলো, সেগুলো ক্রোকাস। কী মিষ্টতায় ভরা ফুল দুটো! পায়ের তলায় চুরচুর করে ভেঙে পড়তে চায়।

এপ্রিল, মে ও জুন– এ তিন মাসে ইংল্যান্ডের সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখেছি। এপ্রিলে এর সূচনা আর সেপ্টেম্বরে পরিণতি।

লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মারিচা গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি.এ. সম্মান ও এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর পেশা ছিল অধ্যাপনা। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি আমাদের দেশের এক জন খ্যাতিমান ভাষাবিদ ও ধ্বনিতত্ত্ববিদ। তাঁর রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব–ধ্বনিবিজ্ঞানবিষয়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এক জন সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি খ্যাত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)', 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা', 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রভৃতি। বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন তাঁর ভ্রমণকাহিনী। এ ছাড়া তিনি ১৭টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩ জুন এক দুর্ঘটনায় মুহম্মদ আবদুল হাই মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

প্রকোপ – আধিক্য, প্রাবল্য।
অকস্মাৎ – হঠাৎ, যা আগে থেকে জানা যায় না।
ঋতুরাজ – ঋতুর রাজা, বসন্ত।
বিশ্বজোড়া – সারা দুনিয়া জুড়ে, বিশ্বব্যাপী।
অপরিমেয় – যা পরিমাপ করা যায় না, অগণিত
সঞ্জীবনী – যা জীবন সঞ্চার করে।
সাদৃশ্য – মিল।
অবিমিশ্র – যাতে কোনো মিশ্রণ নেই, খাঁটি।
প্লানমতো – পরিকল্পিত, পরিকল্পনা অনুযায়ী।
একরাশ – প্রচুর, অগুনতি।

গোলাপোদ্যান – গোলাপ ফুলের বাগান (গোলাপ+ উদ্যান)।
বার্তা – খবর, সংবাদ।
অনন্ত – যার শেষ নেই, অন্তহীন।
বলিহারি – বাহবা।
ধুপছায়া – রোদ ও ছায়ার সংযোগ।

টীকা

সুন্দরের আগুন–ইংল্যান্ডে বসন্ত ঋতুতে বিচিত্র ফুল ফোটে। যেদিকে তাকানো যায় কেবল ফুল আর ফুল। ফুলগুলো যেন চারদিক আলোকিত করে রাখে। লেখক এই প্রকৃতির আশ্চর্য সুন্দর রূপটিকে 'সুন্দরের আগুন' বলেছেন।

জীবনের বার্তা–ইংল্যান্ডে শীতে গাছের পাতা ঝরে যায়। পাতাঝরা গাছের শাখায় তুষার জমে ওঠে। মনে হয়, নিষ্প্রাণ গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বসন্তের আগমনে অকস্মাৎ জেগে ওঠে ওরা– পাতায় পাতায় সবুজের বিপুল সমারোহ। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বসে ফুলের মেলা। কবি প্রকৃতির এই বিচিত্র আয়োজনকেই জীবনের বার্তা হিসেবে দেখেছেন।

কবি এলিয়ট–বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ কবি। তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পাঠ-পরিচিতি

'ফুলের মেলা' মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ভ্রমণকাহিনী 'বিলাতে সাড়ে সাত শ দিন' থেকে সংকলিত। এ অংশটুকুতে ইংল্যান্ডে ফুলের ঋতু বসন্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ডে বিচিত্র ফুলের উপহার নিয়ে আসে বসন্ত ঋতু। শীতের প্রকোপে নিষ্প্রাণ বৃক্ষরাজি বসন্তের আগমনে হঠাৎ করে জেগে ওঠে। গাছের শাখায় শাখায় ফুলের বিপুল সমারোহ মনকে আনন্দে ভরে তোলে। চারদিকে ফুল আর ফুল যেন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়। লাইলাক, টিউলিপ, মে'জ ব্লসম, চেস্টনাট, ডেইজি ইত্যাদি কত বিচিত্র ফুলের মেলা সেদেশে। ঘাসের বুকে শিশিরবিন্দুর মতো শোভা পায় ঘাস ফুল–ডেইজি ও ক্রোকাস। যতদূর চোখ যায়, শুধু ফুল আর ফুল।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী ইংল্যান্ডের ফুলের ঋতু বসন্ত সম্পর্কে জানবে। তার মনে দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সম্রাজ্ঞী মেরির প্রিয় ফুল কোনটি?

ক. গোলাপ খ. লাইলাক
গ. মে'জ ব্লসম ঘ. টিউলিপ

২. 'ফুলের মেলা' রচনায় অনেকগুলো ফুলের নাম আছে। যেমন–

i. গোলাপ, লাইলাক, টিউলিপ
ii. চেস্টনাট, ডেইজি, ডেফোডিলস্
ii. উইলো, গোলাপ, ঘাসফুল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের ৩ নম্বর থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাটিতে যদি চাইছি–দেখছি ঘাসে ফুল। অবিমিশ্র ঘাস কোথাও নেই। শিশিরবিন্দুর মতো ফুলের অনন্ত শ্বেতকণিকা ঘাসের মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছে। সবার পিছে, সবার নিচে সর্বহারাদের মাঝে ঘাস এখানে ছোট হয়ে নেই। সবার আনন্দের ভাগ সেও যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্য তারও বুক ফুলে ভরে রয়েছে।

৩. উদ্ধৃতাংশটি একটি

ক. প্রবন্ধের অংশ   খ. গল্পের অংশ
গ. ভ্রমণকাহিনীর অংশ   ঘ. উপন্যাসের অংশ

৪. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশিত হয়েছে–

ক. ফুলের রংবৈচিত্র্য   খ. ফুলের সৌন্দর্যবৈচিত্র্য
গ. ফুলের ঘ্রাণবৈচিত্র্য   ঘ. ফুলের প্রকাশবৈচিত্র্য

৫. 'অবিমিশ্র ঘাস কোথাও নেই'–কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ–

i. সব ঘাস ফুলের সাথে মিশে আছে
ii. ফুলবান গাছের সাথে ঘাসগুলো মিশে আছে
iii. ফুলবিহীন একটি ঘাসও নেই

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. i ও ii
গ. iii   ঘ. ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **উদ্ধৃত অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সপ্তাহ কি পক্ষকালের প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে শীতের প্রকোপে নিষ্প্রাণ তরুলতায় অকস্মাৎ একদিন প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখলাম। মৃতের মধ্যে জীবন কী করে সঞ্চারিত হয় আর প্রকৃতিতে সে জীবন কী করে তরঙ্গায়িত হয়, ইংল্যান্ডের ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। সন্ধ্যায় এক রকম দেখি ত সকালে অন্য রকম। আরো সুন্দর, আরও ভালো। প্রকৃতির যেদিকে চাই, সেদিকেই দেখি যেন সুন্দরের আগুন লেগে গেছে।

ক. উদ্ধৃত গদ্যাংশটিতে কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?
খ. 'মৃতের মধ্যে জীবনের সঞ্চারণ' বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের আলোকে বসন্ত ঋতুর রূপবৈচিত্র্যের বর্ণনা দাও।
ঘ. 'প্রকৃতির যে দিকে চাই, সেদিকেই দেখি যে সুন্দরের আগুন লেগে লেগে গেছে।'–কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. **উদ্ধৃত অংশটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

শীতকালে যেভাবে এরা শুকিয়েছিল, আমাদের দেশে হলে বেশ ভালো জ্বালানি হত। কিন্তু বসন্ত আসতে না আসতে প্রকান্ড–চেস্টনাট গাছের পাতায় পার্কগুলো ছায়াসুনিবিড় হয়ে উঠল। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কাশফুলের মতো শিষ মাথায় নিয়ে তাদের শ্বেতফুল বাতাসের ভারে থরে থরে কাঁপছে। একেই বলে জীবনের জাগরণ। দৈত্যের মতো প্রকান্ড গাছও স্নিগ্ধতায় ও সৌন্দর্যে মাথায় একরাশ ফুল নিয়ে মনোরম হতে চাইছে।

ক. বর্ণিত গাছপালার মধ্যে আকৃতিগতভাবে কোন গাছগুলো বৃহৎ?
খ. নিষ্প্রাণ প্রকৃতির মাঝে প্রাণের সঞ্চার হয় কীভাবে?
গ. আমাদের বসন্ত ঋতুর সঙ্গে ইংল্যান্ডের বসন্ত ঋতুর তুলনা কর।
ঘ. একেই বলে 'জীবনের জাগরণ' –কথাটি বিশ্লেষণ কর।

ভাষা ও শিক্ষা

আবুল মনসুর আহমদ

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। এটা বিপ্লবের দিন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা জাতীয় স্বকীয়তা। সে স্বকীয়তা লাভ হইতে পারে শুধু নিজস্ব সাহিত্যে। নিজস্ব সাহিত্য হইতে পারে কেবল মাতৃভাষায়।

শিক্ষা এসবের গোড়ার কথা। যে ভাষায় মায়ের কাছে প্রথম বুলি শিখিয়াছি, যে ভাষায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিব, জীবনের শিক্ষা লাভ করিব সেই ভাষাতেই, এটা ত পানির মতো সরল কথা।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে সাথে একসঙ্গে তিনটা কাজ হইয়া যায়। এক, শিক্ষাদান ও জ্ঞান লাভ সহজ হয়। দুই, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তিন, বিদ্যাও আভিজাত্যের আইভরি টাওয়ার হইতে জনগণের মধ্যে নামিয়া আসে। এর একটাও আর একটা ছাড়া হয় না।

শিক্ষাদান হইল শিক্ষক যা বুঝেন ছাত্রকে তাই বুঝাইয়া দেওয়া। যত বড় বিজ্ঞানী হউন, আর ইংরাজি, ফরাসি, জার্মানি, রুশীয়, আরবি, ফারসি যে ভাষাতেই সে বিজ্ঞান পড়িয়া থাকুন, আপনি তা বুঝিয়াছেন আপনার মাতৃভাষাতেই। কাজেই অপরকে বুঝাইতে পারিবেন সেই ভাষাতেই। যিনি তা পারিবেন না তিনি নিজেই সেটা বুঝেন নাই; মুখস্থ করিয়াছেন মাত্র। নিজেদের অর্জিত বিদ্যা বাসা বাঁধিয়াছে ইহাদের ঠোঁটে, বড়জোর মগজে। অন্তরে প্রবেশ করে নাই। বিদ্যার ফল তাঁরা নিজেরাই পান নাই। ছাত্রদের দিবেন কোথা হইতে? পক্ষান্তরে যাঁহারা জ্ঞানকে তাঁহাদের অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝেন, মাতৃভাষায় ছাত্রদের মধ্যে সে জ্ঞান অধিকতর ফলদায়কভাবে বিতরণ করিতে পারিবেন।

ভাষারই উদ্দেশ্য হইল নিজের মনের ভাব অপরকে বুঝানো। যেসব শব্দ আমরা বলি ও বুঝি, আমাদের কথাবার্তায় যেসব শব্দ চালু হইয়াছে মূল যে ভাষারই হউক সেসবই বাংলা শব্দ। আমাদের জনগণ অর্ডারলিকে আর্দালি, বেঞ্চকে বেঞ্চি, টেবলকে টেবিল, বটল্‌কে বোতল, ডক্টরকে ডাক্তার, হসপিটালকে হাসপাতাল, ম্যাজিস্ট্রেটকে মাজিস্টর, কন্ট্রাকটারকে কন্টাকদার, গভর্নমেন্টকে গবরমেন্ট, ট্রেজারিকে তেরজুরি, স্কুলকে ইশকুল, স্টেশনকে ইসটিশন, ডাবলকে ডবল, গ্রেটিংকে গেরাটিন, সিমেন্টকে বিলাতি মাটি, ক্যাপ্টেনকে কাপতান, টার্পেন্টাইনকে তার্পিন, অফিসকে আফিস, কার্নিশকে কারনিশ, টর্চলাইটকে টিপবাতি, টিওবওয়েলকে টিপকল, ব্রাশকে বুরুশ, কেটলকে কেতলি ইত্যাদি হাজারো বিদেশি শব্দকে সহজ ও মিষ্টি দেশি শব্দে পরিণত করিয়াছে। এই সরল রূপে সেসব শব্দ বেমালুম বাংলা শব্দ হইয়া গিয়াছে।

এই প্রক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে। দালান–ইমারতের রাজ–মিস্ত্রী যোগালিয়া, জাহাজের খালাসি–সুকানি, কলকারখানার মিকানিক, ছাপাখানার কম্পোজিটর, মেশিনম্যান ইত্যাদি হাজার হাজার ভাষাকার আমাদের জন্য পরিভাষা রচনা করিবার কাজ করিয়া যাইতেছে। এদের মুখে উচ্চারিত বিদেশি শব্দসমূহের যে রূপকে পন্ডিতেরা বলেন অপভ্রংশ, আসলে সেগুলিই ঐসব শব্দের বাংলারূপ সুতরাং আমাদের পরিভাষা।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। ইংরেজি নবেলে 'বেন্ড অব দি রিভার', 'এলবো অব দি রিভার' ও 'বাল্‌জ অব দি রিভারের' পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া উহাদের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিতে লাগিলাম। অনেক অভিধান ঘাঁটিলাম। মস্তিষ্ক আলোড়ন করিলাম। ফল হইল না। অভিধানে 'বেন্ড' ও 'এলবো' দুইটাকে বাঁক বলে। কিন্তু শব্দ দুইটির প্রয়োগ তা বলে না। আর বাল্‌জের অর্থ কোনো জিনিসের প্রশস্ত, স্ফীত বা উদ্‌গত অংশ।

এমন সময় গ্রামের বাড়িতে গেলাম। ক্ষেত-খামার দেখিতে কামলাদের কাছেও যাইতে হইল। তাহারা নদীর ধারে কাজ করিতেছিল। ছোট নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি নদীর 'বাল্‌জ' দেখিলাম। 'বেন্ড' এবং 'এলবোর' পার্থক্য বুঝিলাম। বাঁকঠেশ ও কুনিভাঙা ওদের জন্য মামুলি শব্দ। বাড়ি যাওয়ার এমন আনন্দ ইহার আগে আর পাই নাই। কারণ গ্রামে গিয়াছিলাম জ্ঞান বিতরণের অহংকার লইয়া। ফিরিয়া আসিলাম জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রদ্ধানত মস্তকে।

বিদ্যালয় এখন আর কতিপয় বড়লোকের বিশেষ অধিকার নয়। শিক্ষার মানেই এখন জনগণের শিক্ষা। শিক্ষার 'স্ট্যান্ডার্ড' মানে জ্ঞানের 'স্ট্যান্ডার্ড', মিডিয়ামের 'স্ট্যান্ডার্ড' নয়। ইংরাজিতে শিক্ষা দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না। বিদেশি শিক্ষার আমি বিরোধিতা করিতেছি না। বিদেশি ভাষা শিক্ষা নিশ্চয় দরকার। সভ্য সব জাতি তাহা করিতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে দুনিয়া জাহান আর আগের মতো বিচ্ছিন্ন নাই। আকারেও অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক মিলামিশাও অনেক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আরও হইবে। সবাইকে সবার ভাষা শিখিতে হইবে আমরাও শিখিব। কিন্তু সেটা হইবে অন্যান্য সভ্য জাতির মতোই। বিদেশি ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়।

লেখক-পরিচিতি

আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি আইনব্যবসায়ে যোগ দেন। পরে তিনি দীর্ঘকাল সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিক জীবনেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কেবল সাংবাদিকতা ও সাহিত্য নয়, রাজনীতির জগতেও তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। রাজনীতির জগতে যে দুর্নীতি ও অনাচার ঘটে তিনি তা নিকট থেকে দেখেছিলেন। এ সকল অনাচারকে তিনি তাঁর লেখায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন। সামাজিক নানা কপটাচারও তাঁর বিদ্রূপের চাবুক থেকে রেহাই পায়নি। 'আয়না' ও 'ফুড কনফারেন্স' তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক গল্পগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য বই 'গালিভরের সফরনামা', 'আসমানী পর্দা' ও 'পাক-বাংলার কালচার' 'আত্মকথা' 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বৎসর' তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আবুল মনসুর আহমদ মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

মর্মকথা – মূলকথা।

স্বকীয়তা – নিজস্বতা, মৌলিকতা।

উৎকর্ষ – মান, সমৃদ্ধি।

আভিজাত্য – বংশমর্যাদা, উচ্চ সম্মান, কৌলিন্য। আইভরি টাওয়ার (Ivory Tower) গজদন্ত মিনার (হাতির দাঁতে তৈরী মিনার)। এখানে জনগণের সম্পর্কবিহীন ওপরতলার মানুষের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

অপভ্রংশ – মূল শব্দের বিকৃত রূপ। ভাষার বিবর্তনে প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ।

পরিভাষা – বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দাবলি, প্রতিশব্দ।

মিকানিক (Mechanice)– কারিগর, দক্ষ কর্মী।

সুকানি – লঞ্চ বা জাহাজ চালকের সহকারী।

কম্পোজিটর (Compositor)–যিনি ছাপাখানায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্য সাজানোর কাজ করেন

নভেল (Novel)–উপন্যাস।

স্ট্যান্ডার্ড (Standard)–মান, আদর্শ।

মিডিয়াম (Medium)–মাধ্যম।

বেন্ড (Bend)–বাঁক, এখানে নদীর বাঁক।

এলবো (Elbow)– সাধারণ অর্থে কনুই। এখানে নদী যেখানে কোণ সৃষ্টি করে বাঁক নেয় সে অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

কুনিভাঙা – এ আঞ্চলিক শব্দটিকে লেখক 'এলবো অব দি রিভার (Elbow of the river) এর সুন্দর প্রতিশব্দ হিসেবে উল্লেখ করছেন।

যোগালিয়া – রাজমিস্ত্রির সহকারী।

পাঠ-পরিচিতি

‘ভাষা ও শিক্ষা’ প্রবন্ধটি লেখকের ‘পাক–বাংলার কালচার’ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

একুশে ফেব্রুয়ারির মর্মকথা জাতীয় স্বকীয়তা। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এই স্বকীয়তা অর্জিত হতে পারে। মাতৃভাষাই জ্ঞান আদান–প্রদানের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম। শিক্ষা এখন জনগণের অধিকারের বস্তু। জনগণ যে ভাষা বোঝে সে ভাষায় তাদের শিক্ষা দিতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান মানে বিদেশি ভাষা বর্জন নয়। দুনিয়া দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে। জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চা ও জাতিতে জাতিতে মেলবন্ধনের প্রয়োজনে আমরা বিদেশি ভাষা শিখব। তবে আগে মাতৃভাষা পরে বিদেশি ভাষা।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। সে প্রকৃত জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ হবে এবং নিজের দেশ ও দেশের সংস্কৃতির প্রতি তার সুমনোভাব গড়ে উঠবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘ভাষা ও শিক্ষা’ প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে গৃহীত?
   ক. পাক–বাংলার কালচার খ. আয়না
   গ. আসমানী পর্দা ঘ. আত্মকথা

২. আমরা প্রকৃত জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ হব কখন?
   ক. একুশকে স্মরণ করলে খ. মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ থাকলে
   গ. সুস্থ সংস্কৃতির মাধ্যমে ঘ. পাঠে মনোযোগ থাকলে

৩. ‘কুনিভাঙা’ আঞ্চলিক শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
   ক. কুনুই খ. অঞ্চলের নাম
   গ. সড়কের মোড় ঘ. নদীর বাঁক

৪. মুখস্থবিদ্যার ফল কতটুকু?
   ক. ঠোঁটে উচ্চারণ করা যায় না খ. প্রাণে বেজে ওঠে
   গ. অন্তরে প্রবেশ করে না ঘ. মগজে থাকে না

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বিদ্যালয় এখন আর কতিপয় বড়লোকের বিশেষ অধিকার নয়। শিক্ষার মানেই এখন জনগণের শিক্ষা। শিক্ষার ‘স্ট্যান্ডার্ড’ মানে জ্ঞানের ‘স্ট্যান্ডার্ড’, মিডিয়ামের ‘স্ট্যান্ডার্ড’ নয়। ইংরেজিতে শিক্ষা দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না। বিদেশি শিক্ষার আমি বিরোধিতা করিতেছি না। বিদেশি ভাষা শিক্ষা নিশ্চয় দরকার। সভ্য সব জাতি তাহা করিতেছে। জ্ঞান–বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে দুনিয়া জাহান আর আগের মতো বিচ্ছিন্ন নাই। আকারেও অনেক ছোট

হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক মিলামিশাও অনেক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আরও হইবে। সবাইকে সবার ভাষা শিখিতে হইবে আমরাও শিখিব। কিন্তু সেটা হইবে অন্যান্য সভ্য জাতির মতোই। বিদেশি ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়।

ক. জ্ঞান আদান–প্রদানের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম কোন ভাষা?

খ. 'শিক্ষার মানেই এখন জনগণের শিক্ষা'–বুঝিয়ে লেখ।

গ. উপরের উদ্দীপকটি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য হতে পারে–বুঝিয়ে লেখ।

ঘ. "শিক্ষার 'স্ট্যান্ডার্ড' মানে জ্ঞানের 'স্ট্যান্ডার্ড', মিডিয়ামের 'স্ট্যান্ডার্ড' নয়"।–কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। এটা বিপ্লবের দিন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা জাতীয় স্বকীয়তা। সে স্বকীয়তা লাভ হইতে পারে শুধু নিজস্ব সাহিত্যে। নিজস্ব সাহিত্য হইতে পারে কেবল মাতৃভাষায়। শিক্ষা এসবের গোড়ার কথা। যে ভাষায় মায়ের কাছে প্রথম বুলি শিখিয়াছি, যে ভাষায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিব, জীবনের শিক্ষা লাভ করিব সেই ভাষাতেই, এটা তো পানির মতো সরল কথা।

ক. কত সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?

খ. মায়ের কাছে শেখা ভাষায় কথা বলতে আমরা কেন এত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি? লেখ।

গ. উদ্দীপকের আলোকে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের গুরুত্ব লেখ।

ঘ. 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা জাতীয় স্বকীয়তা।'–কথাটি ব্যাখ্যা কর।

রবীন্দ্রনাথের কথা
আনিসুজ্জামান



বড় পরিবারের ছোটো ছেলে। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে কাঁদতেন ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে, ইস্কুলে ভর্তি হয়ে কান্না জুড়লেন ইস্কুলে না-যাওয়ার জন্যে। সাত-আট বছর বয়স যখন, তখন থেকে কবিতা লেখার চেষ্টায় সময় নষ্ট করছেন। লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ নেই। বড় বাড়ির মধ্যে পরিচারকদের শাসনে দিন কাটত বলে বাইরের জগৎ সম্পর্কে বড় মমতা ছিল মনে মনে। বাবার সঙ্গে হিমালয় বেড়িয়ে এসে সে-মমতা গেল বেড়ে, পড়াশোনায় এল আরো ঔদাসীন্য, প্রকৃতির সঙ্গে মেলবার জন্য মন আরো ব্যাকুল হলো। ইস্কুল যাওয়া বন্ধ হলো একদিন। বড় দিদি দুঃখ করে বললেন, ছেলেটার মানুষ হওয়ার আশা আর রইল না।

ঘরের পড়ার চাপ ছিল কম নয়। তবু সাহিত্যের একটা আবহাওয়া ছিল বাড়িতে। তাই গুন্‌গুন্ সুরে কাব্যচর্চা চলতে লাগল। বড় বড় বিষয় নিয়ে বিরাট বিরাট কাব্য নয়। মনের কথা ছন্দে ভরে দেওয়া। মন-কেমন-করার কথা সেসব। কিসের যেন অভাব অনুভব করছিলেন মনে মনে। সেসব কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা।

বাড়ির বারান্দা থেকে গাছের আড়ালে যেদিন সূর্যোদয় দেখলেন, সেদিন কী এক অপরূপ আনন্দে মন গেল ভরে। সেই অভাববোধটা ঘুচে গেল। প্রকৃতিকে দেখলেন নতুন চোখে। মানুষকেও। দুজন মুটে সামনে দিয়ে যাচ্ছিল কাঁধে হাত রেখে। ভারি সুন্দর লাগল তাঁর। চিরকালের মানুষকে দেখতে পেলেন এদের মধ্যে।

এই চিরকালের মানুষ আর চিরকালের প্রকৃতি মন ভুলালো তাঁর সারাটা জীবন ধরে। অথচ সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন না সহজে। মানুষের সংসর্গ সাধারণত তাঁকে বিব্রত করে এসেছে। মানুষের সঙ্গে মিলতেও চান, অথচ মেলবার সময়ে মনের বাধা দূর হয় না।

অনেক সময়ে তাই সন্দেহ হয়েছে মনে: মানুষের কথা ঠিকমতো বলতে পারলেন তো তাঁর কবিতায়? যে-ছেলে তাঁর কবিতা না পড়ে নেড়ি কুকুরের পেছনে দৌড়ে বেড়ায়, তার মনের কথাটা কি ব্যক্ত করতে পেরেছেন? দেশের সাধারণ লোক-যারা হাল চষে, গুণ টানে, কল-কারখানা চালায়- তাদের কথা কি বলা হলো তাঁর রচনায়? সারাটা জীবন ধরে কি খেলার বাঁশিই বাজালেন তিনি?

আবার উলটো কথাটাও মনে হয়েছে কত সময়ে: যখন তিনি সাহিত্যেক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, রাজা–বাদশা আর বড় বড় বীরদের নিয়েই তখন গল্প–উপন্যাস লিখতেন সকলে। তিনিই তো প্রথম বাংলা দেশের গ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে, বলেছেন আটপৌরে জীবনের কথা। এমন করে আর কে বলেছে?

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভারের বৈচিত্র্য ও পরিমাণ সমালোচকদের হতবাক করে দেয়: হাজারখানেকের বেশি কবিতা; দু হাজারের বেশি গান–কয়েকটি ছাড়া তার সুরও তাঁর দেওয়া; আটটা উপন্যাস; ছোটগল্পের অন্তত আটটি সংকলন; প্রায় দু ডজন নাটক–নাটিকা; সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত। নিজের লেখার ইংরেজি অনুবাদ এবং এশিয়া–ইউরোপ–আমেরিকায় দেওয়া ভাষণ কম নয়। শেষ বয়সে ধরে ছিলেন ছবি আঁকা– তাও দেশবিদেশে সমাদৃত হলো। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ; সমাজ ও ধর্ম–সংস্কারের বিষয়েও পিছিয়ে থাকেননি: রাজনীতিতেও অংশ নিয়েছেন। একজন মানুষ কী করে পারেন এত কিছু করতে!

আর তাঁর রচনাবলির গুনের জন্যে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে শেকসপিয়র, গ্যয়টে ও ভিক্তর উগোর সঙ্গে। নোবেল পুরস্কার লাভ তাঁর গুণের সামান্য স্বীকৃতি মাত্র।

তবু তিনি তৃপ্তিহীন। নিজের কীর্তিকে নিজে বিশ্বাস করেন নি। বলেছেন, কালের তরঙ্গাঘাতে এসব ধুয়েমুছে যাবে।

তবু শেষ বয়সে আবার বলছেন: তাঁর চেয়েও বেশি আপন করে যে সাধারণ মানুষকে জেনেছে, সেই কবির অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।

মানুষকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলেন বলেই এ–কথা বলতে পেরেছিলেন তিনি। যতই বয়স বেড়েছে, ততই চেয়েছেন চিরকালের মানুষ হয়ে উঠতে। দেশের বাঁধন, ধর্মের গণ্ডি, পেশার শাসন– এসব পেরিয়ে মানুষ যেখানে এক, সেই ক্ষেত্রে পৌঁছোতে চেয়েছেন। কবি তাই বলেছেন, জলের ধর্ম যেমন তার জলত্ব, তাঁরও তেমনি একটা ধর্ম আছে, তার নাম মনুষ্যত্ব।

এই মনুষ্যত্বের অপমান তাই বড় মর্মে বেজেছে তাঁর সারা জীবন ধরে। যখন দেখেছেন, এক জাতের মানুষ এলে জাজিমে বসতে পায়, আরেক জাতের মানুষ এলে জাজিম তুলে বসতে বলা হয়, তখন মনে বড় আঘাত পেয়েছেন। যখন দেখেছেন, এক ধরনের মানুষ অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে মোটা হয়, আর অন্য ধরনের মানুষ পরিশ্রম করে শুধু নিজের শক্তি ক্ষয় করে, তখন সে–ব্যবস্থার নিন্দা করেছেন। যখন দেখেছেন, এক দেশের লোক অন্য দেশ দখল করে যাদের দেশ তাদের পায়ের ভৃত্য বানিয়ে ফেলে, তখন প্রতিবাদ না করে পারেন নি।

যে অত্যাচার করে, সেও মানুষ, কিন্তু সে তার মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। আর যে অত্যাচারিত হয়, সেও মানুষ, মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি তার জোটে নি।

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, আশি বছরের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে, তাই মনের মধ্যে শুধু হতাশা জন্মে তাঁর। মানুষের এ কী রূপ দেখলেন জগৎ জুড়ে! তবু জোর করে বলেছেন: 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো।' আশা করেছেন, প্রলয়ের পর যেমন নির্মল দিন দেখা দেয় প্রকৃতিরাজ্যে, তেমনি আসছে সেই দিন– যেদিন মানুষের অপমানে পৃথিবী আর কলুষিত হবে না। প্রকৃতি যে–সম্ভার সাজিয়েছে থরে থরে, মানুষমাত্রই তার ভাগ পাবে। দারিদ্র্য, রোগ, অশিক্ষা দূর হবে মানুষের জীবন থেকে, যেমন দূর হবে হিংসা, কুৎসিত লোভ আর হানাহানি।

সেই নতুন পৃথিবী রচানার প্রেরণা তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর অবিস্মরণীয় রচনামালায়, সেই নতুন পৃথিবীতে তাঁর রচনার নতুন মূল্যায়ন হবে।

লেখক পরিচিতি

আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক। দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। পণ্ডিত ও গবেষক হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি রয়েছে তাঁর। তাঁর বহুল পরিচিত প্রবন্ধ গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য; 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', 'স্বরূপের সন্ধানে', 'পুরোনো বাংলা গদ্য' 'বাঙালী নারী: সাহিত্য ও সমাজে' ইত্যাদি। শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা তাঁর গ্রন্থ হচ্ছে : 'কত কাল ধরে', 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', 'গল্পে গল্পে আবদুল্লাহ আল মুতী।' সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত। তাঁর জন্ম ১৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭, কলকাতায়।

শব্দার্থ ও টীকা

পরিচারক – গৃহকর্মী।
মমতা – মায়া, স্নেহ।
ঔদাসীন্য – আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব।
অপরূপ – অপূর্ব, অতুলনীয়, বিস্ময়কর।
বড় দিদি – বড় বোন, রবীন্দ্রনাথের বড় বোনের নাম সৌদামিনী।
মুটে – মোট বা বোঝা বহন করে এমন।
সংসর্গ – মেলা মেশা, সঙ্গ।
বিব্রত – দিশেহারা, ব্যতিব্যস্ত, অস্বস্তি বোধ হয় এমন।
আটপৌরে – সবসময় ব্যবহার করা হয় এমন।
গন্ডি – নির্দিষ্ট সীমা, চৌহদ্দি।
মনুষ্যত্ব – মানবতা, জাতি ধর্ম বর্ণ বিচার করে প্রতিটি মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখানোর মানসিকতা।
মর্মে বেজেছে – কোমল হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করেছে।
জাজিম – ফরাশ, বিছানা, গালিচা ইত্যাদির ওপর বিছানোর জন্য এক ধরনের পুরু চাদর। খাটের গদি।
অবিস্মরণীয় – ভুলবার নয় এমন।
নির্মল – স্বচ্ছ, অমলিন।
সম্ভার – দ্রব্যসামগ্রী।
প্রলয় – ব্যাপক ধ্বংসলীলা, কেয়ামত।
কুৎসিত – বিশ্রী, কদাকার।
প্রেরণা – উৎসাহ, উদ্দীপনা।
হিমালয় – ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত পর্বতশ্রেণী। হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম এভারেস্ট।
আটপৌরে জীবন– অতি সাধারণ জীবন।

পাঠ পরিচিতি

বাংলা ও বাঙালির সেরা সাহিত্য–প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে বিশ্বসভায় তিনি দিয়েছেন মর্যাদার আসন। তাঁর শৈশব কেটেছে একদিকে শাসনে–বাঁধনে, অন্যদিকে মুক্ত জীবনের প্রতি মমতায়। বাড়িতে সাহিত্য–চর্চার অনুকূল পরিবেশ সাহিত্যের দিকে টেনেছে তাঁর মনকে। আকৃষ্ট হয়েছেন চারপাশের প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি। সাহিত্যে তিনি প্রকৃতি ও মানুষের কথাই বলেছেন বার বার, বলেছেন নানাভাবে। বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কথা। সবার ওপরে স্থান দিতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বকে। তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন নতুন পৃথিবী রচনার প্রেরণা। 'রবীন্দ্রনাথের কথা' প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের এসব দিক তুলে ধরেছেন সহজ ভাষায় এবং অল্প কথায়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং তাঁর বুহমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'ছেলেটার মানুষ হওয়ার আশা আর রইল না'–কে দুঃখ করে বলেছিলেন?

ক. বাবা খ. শিক্ষক

গ. মেজদা ঘ. বড়দিদি।

২. রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন–

i. গ্রাম বাংলার ছবি।

iii. মনীষীদের জীবনী।

iii. আটপৌরে জীবনের কথা।

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সাধারণ মানুষের কথা ফুটিয়ে তুলেছিলেন, কারণ–

i. তিনি সবার সাথে সহজে মিশতে পারতেন।

ii. অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তিনি চারপাশকে বিশ্লেষণ করতেন।

iii. মানুষের প্রতি ছিল তাঁর মমত্ববোধ।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. সারাটা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথের মন ভুলাতে প্রভাব বিস্তার করেছে কোনটি?
ক. দেশের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি। খ. বাড়ির পরিবেশ ও নিয়মকানুন।
গ. বড় বড় বীরদের জীবনকাহিনী। ঘ. চিরকালের মানুষ ও তাদের জীবনধারা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ডালিম মণ্ডল মীর্জা বাড়ির দু'বিঘা জমি চাষ করেন। মৌসুম শেষে জোদ্দারের পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে যা পায় তা দিয়ে এক বেলা খেয়ে কোনমতে কেটে যায় তাদের পাঁচ জনের সংসার। বড় মেয়ের বিয়ের সময় বেশ কিছু টাকা ধার নিয়েছেন মীর্জা সাহেবের কাছ থেকে। এবারে অনাবৃষ্টিতে প্রত্যাশিত ফসল ও পাওনা টাকা দিতে পারল না সে জোদ্দারকে। এর খেসারত হিসাব জোদ্দার মীর্জা, ডালিম মণ্ডলকে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই থেকে বিতাড়িত করল। ডালিম মণ্ডলদের মত মানুষের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখনী ছিল সদা–সোচ্চার।

ক. রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন তখন সকলে কী নিয়ে লিখতেন?
খ. জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ কোন অভিজ্ঞাটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন–ব্যাখ্যা কর।
গ. জোদ্দার মীর্জার এই মনোভাবকে কিসের অপমান বলা যায় তা 'রবীন্দ্রনাথের কথা'র আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ডালিম মণ্ডলদের মতো মানুষদের অবস্থার উত্তরণের উপায় রবীন্দ্রনাথের আশাবাদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

গাছের সঙ্গে জীবন

দ্বিজেন শর্মা



আমি তখন খুব ছোট, সবে পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। শীতের দিনে বাবা খুব ভোরে ডেকে তুলতেন। তার সঙ্গে যেতে হত বাগানে। তিনি তার লাগানো গাছে ঘটি ঘটি জল ঢালতেন। আর সেই জল আমাকে টেনে আনতে হত পুকুর থেকে।

বাড়ির পেছনে ছিল একটি বড় জঙ্গাল। বাঁশঝাড়, বড় বড় বুনো গাছপালা নিয়ে গড়ে ওঠা এমন একটি জায়গা প্রায় সকল বাড়িতেই ছিল। সুযোগ পেলেই ওখানে পালিয়ে যেতাম। সাপখোপ, বনবিড়াল এমনি নানা জীবজন্তু ওখানে বসে থাকত। তবু ভয় পেতাম না।

বড় বড় গাছের খোঁড়লে বাসা বাঁধত বসন্তবৌরি। সবুজ রঙের পাখি, মাথায় লাল টোপর। আরেকটি পাখিও দেখতাম, চড়ুইয়ের মতো সবুজ রঙের, গলায় একটা নীল গোলমতো দাগ, নানান সুরে ডাকত, সম্ভবত হরবোলা। পাখি ও গাছ কাকে বেশি ভালোবাসতাম বলা মুশকিল। নিচে ঘুরে বেড়াত বড় সাইজের একটা পাখি। পিঠ খয়েরি, নাম কানাকোয়া, সিলেটে বলে 'মউকা' তাকেও ভারি সুন্দর মনে হত। আর হলদে পাখি মাঝে মাঝে উড়ে এসে উঁচু ডালে বসত। মনে হত এমন সুন্দর পাখি পৃথিবীতে আর দুটো নেই। যেন রূপকথার হিরামন। হলদে পাখির একটা বাচ্চা পোষার জন্য কত কান্নাকাটি করেছি। কেউ এনে দিতে পারেনি।

বড়দা সবজি ফলাতে খুব ভালোবাসতেন, অনেকটা নেশার মতো, বিঘেখানেক একখন্ড জমিতে শীতকালে লাগাতেন আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা, টমেটো, বেগুন আরও কত কী? বীজ আনতেন সার্টন কোম্পানি থেকে। সেই কোম্পানির ক্যাটালগে থাকত সবজির সঙ্গে নানা ফুলের ছবি। এই ফুল এনে দেওয়ার জন্য তাকে বলতাম, পাত্তা দিতেন না। একবার তার সবজিবীজের সঙ্গে এল এক প্যাকেট ফুলের বীজ। আমার আনন্দের সীমা রইল না। উঠোনের মাঝখানে গোলমতোন একটি কেয়ারি বানিয়ে তাতে বীজ বুনলাম। চারা গজালো, ওগুলো বড় হল এবং ফুলও ফুটল। সে কী শোভা, বোঝাতে পারব না। চোখ ফেরাতে পারতাম না। এমন ফুল আগে কখনও দেখিনি। এখন জানি, তেমন কোনো আহামরি জাতের ফুল নয়–'অ্যানুয়েল ক্রিসেন্থিমাম জিনিয়া ক্যালেন্ডুলা', আরও কী কী। এই আমার প্রথম ফুলবাগান, যার স্মৃতি আজও মনে আছে।

গিয়েছিলাম অনেক দূরের এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। বর্ষাকাল, চারদিকে জল থইথই; দেখি, ওদের পুকুরপাড়ে তালগাছ বেয়ে একটি শক্ত লতা উঠেছে। তাতে লালসাদা অজস্র থোকা থোকা ফুল। হালকা একটা গন্ধও ছিল, এখন জানি ওটি 'র‍্যাঙ্গুন ক্রিপাস' বা মধুমঞ্জরি লতা, কেউ কেউ মধুমালতিও বলেন, ভালোবেসে ফেললাম লতাটিকে। তারপর যখন যেখানে থেকেছি অন্তত এই একটি লতা লাগাতে ভুলিনি। আমাদের বাড়ির পোর্টিকোর পাশে আমার লাগানো মধুমঞ্জরি একদিন গোটা চাল ছেয়ে ফেলল। ফুলও ফুটল অজস্র। আমি সেখান থেকে সরতে পারতাম না। সন্ধ্যায় ফুল ফুটত সাদা রঙের। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত সারা বাড়িতে। বাসি ফুল পড়ে লাল হয়ে যেত।

উদ্ভিদরাজ্য এক বিশাল জগৎ। এর যে কোনো একটি শাখা নিয়ে সারাজীবন কাজ করলেও কোনো কূলকিনারা মেলে না। এদের রকমফেরের অন্ত নেই, যেমন আছে এককোষী শৈবাল, তেমনি আছে বিশাল বটগাছ। মাঝখানে নানা ধাপ। নিচের দিকের উদ্ভিদে কোনো ফুল ফোটে না, সেগুলোর জীবনচক্র রহস্যময়। সেই খুঁটিনাটিরও কোনো অন্ত নেই। আমি জলজ শৈবাল 'ক্যারোফাইটা' নিয়ে সাত-আট বছর কাজ করেছি। শীতের সময় লম্বা ছুটিতে বেরিয়ে পড়তাম সেগুলোর খোঁজে। ওদের পাওয়া যায় রাস্তার পাশের ডোবায়, নদীতে এবং বিলে। আমি বাংলাদেশের সবগুলো জেলা থেকেই ক্যারোফাইটা সংগ্রহ করেছি। শুধু বাকি ছিল রংপুর আর দিনাজপুর। একবার এক শীতকালে

নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ থেকে সিলেটের সুনামগঞ্জ পর্যন্ত দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিলাম। সেই সময় বিভিন্ন পরিচিত জনের বাড়িতে থেকেছি, তারা নৌকা করে আমাকে বিলে নিয়ে যেতেন, আমি ক্যারোফাইটা তুলে ফরমালিনের টিনে রাখতাম। এভাবেই আমি সংগ্রহ করেছিলাম হাজারখানেক নুমনা। লন্ডন গেছি কয়েকবার। প্রতিবার পৌঁছেই গিয়েছি বিশ্ববিখ্যাত বোটানিক উদ্যান– কিউগার্ডেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ন্যাচারাল হিস্ট্রির একটি পৃথক বিভাগও আছে। ওখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম ক্যারোফাইটার একটি বড় সংগ্রহও তাদের আছে। সেখানে পৌঁছে দেখি, দরজা বন্ধ। বেল বাজালে একজন লোক আমাকে জানালেন ওটা সাধারণ দর্শকদের জন্য নয়, কেবল বিশেষজ্ঞদের জন্য। আমি বললাম, আমি একজন বিশেষজ্ঞ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং ইচ্ছেমতো আমাকে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে বললেন। চারদিকে শেলফে অসংখ্য বোতলে সারা বিশ্বের ক্যারোফাইটার অজস্র নমুনা সংরক্ষিত। হয়তো আমি ক্যারোফাইটার নতুন কোনো প্রজাতিও পেয়ে যেতে পারতাম এবং সেটি এই জাদুঘরে আমার নামে সংরক্ষিত থাকত। হয়তো সেখানে কোথাও লুকিয়ে আছে একটি নতুন প্রজাতি। আমার আগে যাকে আর কেউ দেখে নি।

এ নিয়ে দুঃখ করা অবান্তর। বিজ্ঞানে কোনো আবিষ্কারই বাদ পড়েনি। একজন না পারলে আরেকজন সেটা সম্পূর্ণ করে। তাই আমি সর্বদাই আশা করি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কেউ বাংলাদেশের ক্যারোফাইটা নিয়ে কাজ করবে। আমার থেকে অনেক ভালোভাবে সেই কাজ সম্পূর্ণ করবে। হয়তো পেয়েও যাবে আনকোরা নতুন দু-একটি প্রজাতি। তাদের এই কাজের সঙ্গে আমিও থাকব, কেননা আমিই এদেশে কাজটি শুরু করেছিলাম।

ক্যারোফাইটা নিয়ে নতুনভাবে কাজ করতে না পারলেও দেশে ফিরে বনজঙ্গলে সুন্দর সুন্দর গাছপালা খোঁজার কাজ করতে থাকি। ছোটবেলায় যেসব গাছগাছালি দেখেছি, সেগুলো খুঁজি। আমাদের বাড়ির পাশের মাধবকুন্ড জলপ্রপাত এবং পাতারিয়া পাহাড়। ঐ পাহাড়ে আমাদের একটি খামারবাড়ি আছে যেখানে আমার কৈশোরের অনেকটা সময় কেটেছে। দুটি পাহাড়ি ছেলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে গভীর বনে ঘুরে বেড়াতাম। এই বন এখন উজাড় হয়ে গেছে। ভাবি, যদি ক্যারোফাইটার উপর কাজ না করে এই বনের গাছগাছালির উপর কাজ করতাম তাহলে অন্তত এখানকার উদ্ভিদরাজ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংরক্ষিত থাকত।

রাশিয়ায় থাকার সময় প্রায়ই পাহাড়ে কাটানো কিশোরবেলার কথা মনে পড়ত। হঠাৎ একদিন মনে হল একটি গাছ দেখেছিলাম আমাদের আবাদের কাছেই, যাতে বড় বড় ঝুলন্ত সাদা ফুল ফুটত। ফল ছিল আতার মতো, সেগুলো নিচে পড়ে থাকত। চারপাশে ছড়িয়ে থাকত বড় বড় খয়েরি রঙের বীজ। সেই গাছটি খুঁজতে লাগলাম। ওখানকার বাসিন্দা আমার এক পুরোনো বন্ধু। জানালেন, এমন দু-চারটি গাছ তিনিও দেখেছেন। এসব গাছের কাঠ কোনো কাজে লাগে না, তাই কেউ কাটত না। কিন্তু ইটভাটায় ইট বানানো শুরু হলে এগুলোর চাহিদা বাড়ে। ওরাই ভাটার জ্বালানি হিসেবে এসব গাছ কিনে নিয়ে গেছে। এমন একটি সুন্দর গাছ আর কোনোদিন দেখব না, কাউকে সেকথা বলাও যাবে না। যা নেই, তার কাল্পনিক বর্ণনা কারও কাজে লাগে না। তবু খুঁজতে লাগলাম এবং একদিন পেয়েও গেলাম আরেকটি গাছ।

বসন্তে বড় বড় সাদা ফুল ফোটে, অপূর্ব সুগন্ধ ছড়ায়। দুলিচাঁপা, আমাদের একমাত্র বুনো ম্যাগনোলিয়া। কিন্তু যে গাছটি নিয়ে এই অনুসন্ধান শুরু তার সঙ্গে দুলিচাঁপার বেজায় অমিল। গাছটি আজও পাই নি। হয়তো আমাদের অঞ্চল থেকে লোপাট হয়ে গেছে, থাকতে পারে অন্য কোথা, অন্য কোনখানে এবং সেই অনিবার্য নিয়মে আমি না পেলেও অন্য কেউ একদিন খুঁজে পাবে, এটাই সান্ত্বনা।

লেখক পরিচিতি

দ্বিজেন শর্মা ১৯২৯ সালের ২৯শে মে মৌলভীবাজার জেলার শিমুলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্কুলে ও কলেজে লেখাপড়া করে অবশেষে ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কিছুদিন তিনি অধ্যাপনা করেন। পরে রাশিয়ায় চলে যান এবং সেখান থেকে রুশভাষার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : মম দুঃখের সাধন, সমাজতন্ত্রে বসবাস, এমি নামের দুরন্ত মেয়েটি, জীবনের শেষ নেই, শ্যামলী নিসর্গ, বাংলাদেশের বৃক্ষ, গাছের কথা ফুলের কথা ইত্যাদি।

দ্বিজেন শর্মা ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি এম. নুরুল কাদের শিশু সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

খোঁড়ল – গর্ত, কোটর

হিরামন – শুকপাখি বা তোতাপাখি বিশেষ (রূপকথার)।

ক্যাটালগ – সুসজ্জিত তালিকা।

কেয়ারি – ফুল–ফলসহ নানা গাছের চারা নির্মাণের উদ্দেশ্যে গঠিত ছোট খেত।

অ্যানুয়েল ক্রিসেন্থিমাম জিনিয়া ক্যালেন্ডুলা– জিনিয়া ফুলটির বৈজ্ঞানিক নাম।

পোর্টিকো – ভবন সংলগ্ন গাড়ি বারান্দা।

শৈবাল – শেওলা

ক্যারোফাইটা – এক প্রকার জলজ শৈবাল বা শেওলা।

ফরমালিন – কড়া গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস ফরমালডিহাইড মিশ্রিত পানির দ্রবণকে ফরমালিন বলে। পচনশীল বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য ফরমালিন ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগনোলিয়া – চাঁপাজাতীয় ফুলগাছ বিশেষ।

পাঠ পরিচিতি

এই রচনাটিতে বাল্যকাল থেকে গাছের প্রতি লেখকের আগ্রহ ও মমতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বড়ো হয়ে গাছ নিয়ে লেখক যে আরো গভীর গবেষণারত হয়েছেন, তাও এ রচনা থেকে আমরা জানতে পারি। গাছের প্রতি লেখকের এই আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বাবা। তাঁর বাবার লাগানো গাছে পানি দেওয়ার জন্য বাল্যকালে খুব ভোরে উঠে লেখককে সাহায্য করতে হত। বড় ভাইয়ের সহায়তায় লেখক বাল্যকালে ফুলের বাগান গড়ে তুলেছিলেন। আত্মীয়–বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লেখক সুগন্ধি ফুলসহ মধুমঞ্জুরি লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে তা লাগান। এভাবে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় উদ্ভিদের প্রতি ভালোবাসা এবং সারা জীবন তিনি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেন।

লেখক বলেছেন, এই বিশাল উদ্ভিদরাজ্যে রকমফেরের অন্ত নেই। এককোষী শেওলা থেকে বিশাল বটগাছ পর্যন্ত অসংখ্য এর বৈচিত্র্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছেন। এ কাজে লেখক নিজের অসম্পূর্ণতা নিয়ে দুঃখ করেননি। বরং বলেছেন, বিজ্ঞানের রাজ্যে একজনের অসম্পূর্ণ কাজ অন্যজন সম্পূর্ণ করবে, এটাই নিয়ম। তিনি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এ নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী এ রচনা পাঠ করে আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা বৃক্ষের শ্রেণী, বৃক্ষ সংরক্ষণ, বপন–পালন সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বড়দা কখন সবজির বাগান করতেন?

ক. গ্রীষ্মকালে　　খ. বর্ষাকালে

গ. শীতকালে　　ঘ. বসন্তকালে।

২. কোনটি হরবোলার বৈশিষ্ট্য–

i. এটি একটি ছোট পাখি।

ii. এটি একাধিক সুরে ডাকে

iii. এটির অন্য নাম মউকা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নবম শ্রেণীর ছাত্র মার্জিত টিফিনের সময় একদিন বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করে। সেখানে সে আলমারির বোতলে তরলপদার্থে নিমজ্জিত নানা রকম লতা, পাতা, প্রাণি ও উদ্ভিদাংশ দেখতে পায়। তখন তার পঠিত "গাছের সঙ্গে জীবন" গল্পের কথা মনে পড়ে। তবে সেখানে সে কোন শৈবাল দেখতে পায়নি।

৩. আলমারির বোতলে লতাপাতা নিমজ্জিত তরলটি হচ্ছে–

ক. পানি　　খ. ফরমালিন

গ. অ্যালকোহল　　ঘ. এসিড

৪. বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরির ক্ষেত্রে কোন বাক্যটি সঠিক?

ক. এটি শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য উন্মুক্ত।

খ. এতে ক্যারোফাইটা রয়েছে।

গ. এটি জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করে।

ঘ. এটি বৃটিশ মিউজিয়ামের চেয়ে সমৃদ্ধ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ভিদরাজ্য এক বিশাল জগৎ। এর যে কোন একটি শাখা নিয়ে সারাজীবন কাজ করলেও কোনো কুলকিনারা মেলেনা। এদের রকম ফেরের অন্ত নেই। যেমন আছে এককোষী শৈবাল, তেমনি আছে বিশাল বটগাছ। মাঝখানে নানা ধাপ। নিচের দিকের উদ্ভিদে কোন ফুল ফোটেনা। সেগুলোর জীবনচক্র রহস্যময়।

ক. উদ্ভিদ রাজ্য বলতে এখানে কী বুঝানো হয়েছে?

খ. উদ্ভিদ রাজ্যের একটি শাখা নিয়ে কাজ করলেও তার কুলকিনারা মেলে না কেন তা ব্যাখ্যা কর?

গ. রকমফের কী? তোমার উদ্ভিদের দুটি রকমফের উল্লেখ কর এবং একটির বর্ণনা দাও।

ঘ. 'নিচের দিকের উদ্ভিদে কোন ফুল ফোটেনা সেগুলোর জীবনচক্র রহস্যময়'। – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।



বিদ্যুৎশক্তির বিরাট সম্ভাবনার দ্বার যেদিন বিজ্ঞানীদের সামনে খুলে গেল সেদিন হয়েছিল মানবসভ্যতার ইতিহাসে নতুন একটি যুগের শুরু। মানুষ যেন তার হাতে পেল রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ, যার আহ্বানে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায় সব কাজ, সব উপকরণ আসে নির্বিঘ্নে। বিদ্যুতের এই আশ্চর্য ক্ষমতা কাজে লাগানোর উপায় জানার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন; পরম ধৈর্যের সাথে করতে হয়েছে সাধনা। ব্যর্থতা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে কখনও, নৈরাশ্যের আঁধার এসেছে নেমে, তবুও হাল ছেড়ে দেননি বিজ্ঞানীরা। আর শেষ পর্যন্ত এই সন্ধানী মানুষদের সাধনাই হয়েছে জয়ী। রন্টগেন, উইলিয়াম ক্রুকস, টমাস আলভা এডিসন—এঁরাই সেই সন্ধানী মানুষ।

বিদ্যুৎশক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের যাঁরা পথিকৃৎ, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, টমাস আলভা এডিসন। এডিসন ছিলেন আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানে অন্যতম প্রধান আবিষ্কারক। এডিসনের জন্ম আমেরিকায়, ১৮৪৭ সালে। তাঁর পিতার অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। ছোটবেলায় বাড়ির আশপাশে শাকসবজির চাষ করে এডিসন এক বছরে প্রায় ৩০০ ডলার জমিয়েছিলেন। এ থেকে অর্ধেক তিনি তাঁর মাকে দেন আর বাকি ১৫০ ডলার দিয়ে ক্রয় করেন নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য। এসব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে তিনি তখন থেকেই নানারকম পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাতে শুরু করেন। এ ছাড়া এডিসন ট্রেনে খবরের কাগজও বিক্রি করতেন। তারপর এডিসন রেল কোম্পানির অনুমতি নিয়ে ট্রেনের মালগাড়িতে হাতে চালানো প্রেসের সাহায্যে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'গ্রান্ডট্রাঙ্ক হেরাল্ড' নামের এই পত্রিকাটির তিনি ছিলেন মুদ্রক, প্রকাশক, কম্পোজিটর, সম্পাদক, রিপোর্টার এবং বিক্রেতা। এ সময় ট্রেনের ঐ মালগাড়িতে অবসর সময়ে তিনি তাঁর রাসায়নিক পরীক্ষাও চালাতেন। এক বার ট্রেনের মেঝেতে কিছু ফসফরাস পড়ে গিয়ে ট্রেনটিতে আগুন ধরে যায়। ট্রেনের চালক তখন গাড়ি থামিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি এডিসনের ছাপার মেশিন ও সব রাসায়নিক দ্রব্য ছুড়ে ফেলে দেন বাইরে। এ ঘটনার সঙ্গেই এডিসনের সাংবাদিকতার ইতি ঘটে।

এরপর এডিসন স্টেশনমাস্টারের ছেলেকে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ার সময় বাঁচিয়ে সহকারী টেলিগ্রাফিস্টের চাকরি পান। এই টেলিগ্রাফের প্রতি ছিল তাঁর দারুণ কৌতূহল।

১৮৬৮ সালে এডিসন ভোল্ট করার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করেন 'ফোনোগ্রাফ'। এই ফোনোগ্রাফই পরে 'গ্রামোফোন' নামে পরিচিত হয়। গ্রামোফোন রেকর্ডে মানুষের প্রথম যে–কথাটি রেকর্ড করা হয় সেটি একটি ইংরেজি ছড়া, 'মেরি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব'।

এডিসনের সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাতি। অবশ্য এডিসনের পূর্বেই ইংল্যান্ডে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কৃত হয়। তখন খুব সূক্ষ্ম প্লাটিনাম তার এবং কাগজ থেকে তৈরি কার্বনের সুতো বাতির ফিলামেন্ট হিসেবে

ব্যবহৃত হত। এডিসন তাঁর নিরলস সাধনার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বাতির সংস্কার করেন। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি এ কাজ শুরু করেন এবং প্রায় এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি এতে সাফল্য লাভ করেন। সুতোর ফিলামেন্ট দ্বারা তৈরী তাঁর এই বাতি একনাগাড়ে জ্বলল প্রায় পঞ্চাশ ঘন্টা। এবার এডিসন অনুসন্ধান চালালেন আগের চেয়ে অনেক বেশি খুঁটিনাটি নিয়ে। কাচের বাল্বের মধ্যে লাগানোর আগে সব রকমের তন্তুকেই এবার চুলোয় পুড়িয়ে কার্বন করে নেওয়া হল।

হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া গেল সবই পরীক্ষা করে দেখা হল। টিস্যু কাগজ, ড্রয়িং কাগজ, আলকাতরা আর ভুষাকালি–মাখানো সুতো, মাছ ধরার সুতো, কাঠের টুকরো, নারকেলের ছিবড়ে, প্রদীপের সলতে– বাদ গেল না কিছুই।

আর নতুন এই বিদ্যুৎবাতি বিক্রি করার জন্য এডিসন নির্মাণ করলেন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানো হল এজন্য। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর ফিলামেন্ট অনুসন্ধানের কাজ অব্যাহত রইল। তারপর প্ল্যাটিনামের ফিলামেন্ট ব্যবহার করে এডিসন আশ্চর্য ফল পেলেন।

টমাস এডিসনের আবিষ্কারের ফলে আলোর পথে মানুষের অভিযাত্রার সর্বশেষ ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ পড়ল। এডিসনের পর ড. ডব্লিউ আর হুইটনি বিদ্যুৎবাতির উন্নয়নের জন্য গড়ে তুলেছিলেন বিরাট এক ল্যাবরেটরি। এক দিন ভুল করে ফিলামেন্ট দু বার পোড়ানো হল। এতে আলো হল আরও উজ্জ্বল। এই ফিলামেন্ট স্থায়ী হল আরও অনেক বেশি। ১৯১০ সালের দিকে এই বাতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এরপর ড. ডব্লিউ ডি কুলিজ এক প্রকার ধাতব দ্রব্য টাঙ্গাস্টেনকে সরু তারে পরিণত করার একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। এতে আলো পাওয়া গেল আরও ভালো। বিদ্যুৎ খরচও গেল কমে। এ আবিষ্কারের পর কার্বন বিদায় নিল, তার হলদে আলোর জায়গা দখল করল টাঙ্গাস্টেন–এর সাদা আলো।

এভাবে বিদ্যুৎবাতির উন্নতি সাধনের জন্য বহু লোক তাঁদের দক্ষতা ও সাধনা কাজে লাগিয়ে গেছেন। ড. আরভিং ল্যাঙ্গা বাল্বে শূন্যতার বদলে চাপের ব্যবহার করেন প্রথম। আর তিনিই সরু তারকে বাঁকিয়ে চাকতির মতো করেন এই চাপ সহ্য করার জন্য। এরপর বাল্বের মধ্যে আরগন আর নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে দিয়ে আরও সুন্দর আলো পাওয়া গেল।

আজকাল ফ্লোরোসেন্ট বাতির ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে। এতে আলো ঠাণ্ডা হয়, বাল্ব উত্তপ্ত হয় কম। এসব বাতি হয় লম্বা টিউবের মতো। আমরা এগুলোকে টিউব লাইট বলে থাকি।

আর বিদ্যুতের এ ব্যবহার শুধু আলো জ্বালানোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই আজ। আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার করে থাকি। মোটকথা, আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রা আজ সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল এ বিদ্যুতের ওপর। ফলে এক দিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলেই আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রেও ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। আমরা চাই কম খরচে বেশি বিদ্যুৎ। তারই জন্য বিজ্ঞানীরা আজও গবেষণা করে চলেছেন। আর এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্পগুলো হচ্ছে বিরাট। এতে বহুলোক কাজ করে বহুভাবে, যেন সন্ধানী মানুষের বিরাট কর্মশালা।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের আধুনিকতম উপায় হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন। এসব কেন্দ্রকে বলা হয় পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। কিন্তু এর কথা জানার আগে আমাদের জানতে হবে পরমাণুর জগৎকে। সেই পরমাণুর জগৎ আবিষ্কারের কাহিনী বিজ্ঞানের অভিযানের আরেক বিস্ময়কর কাহিনী।

লেখক-পরিচিতি

সুব্রত বড়ুয়া ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ছিলোনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে এম.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমীতে কর্মরত। সুব্রত বড়ুয়া সাহিত্যসাধনায় বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় বহন করছেন। তবে বিজ্ঞান বিষয় অবলম্বনে রচিত বিভিন্ন লেখা তাঁকে সমধিক পরিচিতি দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয় ছাড়াও তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হল : **উপন্যাস–** 'গ্রহণের দিন'। **ছোটগল্প–**'জোনাকির শহর', 'কাঁচপোকা'। **শিশুসাহিত্য–** 'এমিল ও গোয়েন্দা কাহিনী', 'এশিয়ার গল্প'। **বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ–** 'চাঁদে প্রথম মানুষ', 'বিজ্ঞানের ইতিকথা', 'সন্ধানী মানুষ', 'বিদ্যুতের কাহিনী' ইত্যাদি।

সুব্রত বড়ুয়া ছোটগল্পের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং শিশুসাহিত্যের জন্য অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

নির্বিঘ্নে – বিনা বাধায়।

সন্ধানী – অনুসন্ধানকারী।

রন্টগেন – বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম রন্টগেন (১৮৪৫–১৯২৩)। তিনি রন্টগেন রশ্মি (রঞ্জন রশ্মি)র আবিষ্কারক যা দিয়ে এক্সরে করা হয়।

উইলিয়ামস ক্রুকস – বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক (১৮৩২–১৯১৯), রসায়নশাস্ত্রে ও তড়িৎবিজ্ঞানে তাঁর দান অপরিসীম।

টমাস আলভা এডিসন – (১৮৪৭–১৯৩১)–গ্রামোফোন, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি আবিষ্কারক আমেরিকার বৈজ্ঞানিক।

পথিকৃৎ – অগ্রণী।

ডলার – মুদ্রা বিশেষ।

প্রযুক্তি – প্রয়োগ করার কৌশল।

প্রেস – ছাপাখানা।

মুদ্রক – যে মুদ্রণ করে, যে ছাপে।

কম্পোজিটর (Compositor)–যারা ছাপাখানায় অক্ষর সাজানোর কাজ করে।

রিপোর্টার (Reporter)-সংবাদ সংগ্রাহক।

ফসফরাস – এক প্রকার দাহ্য পদার্থ।

ইতি – শেষ।

টেলিগ্রাফিস্ট (Telegraphist) তারের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণকে বলে টেলিগ্রাফ। টেলিগ্রাফের কাজ যে করে তাকে টেলিগ্রাফিস্ট বলে।

গ্রামোফোন – রেকর্ডের সাহায্যে ধ্বনি, গান প্রভৃতি ধ্বনিত করার যন্ত্র, কলের গান।

নিরলস – অক্লান্ত।

সংস্কার – শোধন, পরিমার্জন।

ফিলামেন্ট – বৈদ্যুতিক বাতির ভেতর বাঁকানো তারের মতো অংশ। এ অংশটিকেই আমরা জ্বলতে দেখি।

তন্তু – সুতা।

ল্যাবরেটরি (Laboratory) -গবেষণাগার।

কর্মশালা (Workshop) যেখানে অনেক লোক কাজ করে।

পরমাণু – মৌল পদার্থের যে সূক্ষ্মতম অংশকে আর ভাগ করা যায় না।

পারমাণবিক – পরমাণু থেকে উৎপন্ন, পরমাণু বিষয়ক।

পাঠ-পরিচিতি

প্রবন্ধটি লেখকের 'বিজ্ঞানের ইতিকথা : সন্ধানী মানুষ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। মানবজীবনের কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষের অক্লান্ত সাধনার ফলেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি।
বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র অবদানের মধ্যে বিদ্যুৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক এই বিদ্যুতের আবিষ্কার ও বহুমুখী প্রয়োগ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিদ্যুৎশক্তি একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ যেন রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। সন্ধানী মানুষের নিরলস সাধনার বলেই বিদ্যুৎ আশ্চর্য প্রদীপের জাদু সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎশক্তি মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগানোর পথিকৃৎদের অন্যতম হলেন টমাস আলভা এডিসন। এডিসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে ভোল্ট, রেকর্ড যন্ত্র, গ্রামোফোন ও বৈদ্যুতিক বাতি। এডিসনের পরে আরও কয়েক জন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক বাতির উন্নতি সাধন করেন। কেবল আলো জ্বালানো নয়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আজ বিদ্যুতের ব্যবহার অভাবনীয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থী এডিসনসহ অন্যান্য মহৎ বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে জানবে। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে জানতে সে কৌতূহলী হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্ধৃতিটির আলোকে ১ থেকে ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর মানুষ যেন তার হাতে রূপকথার আশ্চর্য প্রদীপ পেল। এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায় সব কাজ। বিদ্যুতের এই আশ্চর্য ক্ষমতা কাজে লাগানোর উপায় জানার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘদিন। পরম ধৈর্যের সঙ্গে করতে হয়েছে সাধনা। ব্যর্থতা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে, কখনও নৈরাশ্যের আঁধার নেমেছে। তবুও হাল ছেড়ে দেননি বিজ্ঞানীরা। তাঁরা হলেন রন্টগেন, উইলিয়াম ক্রুকস, টমাস আলভা এডিসন। আর তাঁরাই হলেন সন্ধানী মানুষ।

১. রূপকথার আশ্চর্য প্রদীপ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
   i. আলাদীনের প্রদীপ
   ii. বিদ্যুতের আলো
   iii. হারিকেনের আলো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

২. 'পরম ধৈর্যের সঙ্গে করতে হয়েছে সাধনা'–কথাটির মানে হল:
   i. বনে গিয়ে গাছের নিচে বসে ধ্যান করা
   ii. বারবার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করা
   iii. ধৈর্যসহকারে জীবন কাটানোর চেষ্টা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৩. এঁরাই হলেন 'সন্ধানী মানুষ'–এখানে সন্ধানী মানুষ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
   ক. খুঁজে পাওয়া মানুষ খ. যাদেরকে সন্ধান করছে
   গ. কিছু পাবার আশায় যারা সন্ধান করে ঘ. যারা মানুষকে সন্দেহ করে

৪. বিদ্যুৎশক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন:
   ক. রন্টগেন খ. উইলিয়াম ক্রুকস
   গ. টমাস আলভা এডিসন ঘ. ড. ডব্লিউ হুইটনি

৫. 'রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ' প্রবন্ধটি সুব্রত বড়ুয়ার কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে–
   ক. বিজ্ঞানের ইতিকথা খ. বিদ্যুতের কাহিনী
   গ. সন্ধানী মানুষ ঘ. জোনাকির শহর

৬. বিদ্যুৎ উৎপাদনের আধুনিকতম উপায় হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন।–এখানে পারমাণবিক শক্তি বলতে কী বোঝানো হয়েছে–
   ক. পরমাণু থেকে উৎপন্ন শক্তি খ. আগুন থেকে উৎপন্ন শক্তি
   গ. তেল থেকে উৎপন্ন শক্তি ঘ. কয়লা থেকে উৎপন্ন শক্তি

৭. কর্মশালা মানে কী?
   i. গবেষণাগার
   ii. যেখানে অনেক লোক কাজ করে
   iii. শোধনাগার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিদ্যুৎশক্তি একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ যেন রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ, যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। মানুষের নিরলস সাধনার বলেই বিদ্যুৎ অর্থাৎ আশ্চর্য প্রদীপের জাদু সৃষ্টি করেছে। টমাস আলভা এডিসন বিদ্যুৎশক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগানোর জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেন। এডিসনের পরে আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী এই বৈদ্যুতিক বাতির উন্নতি করেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার অভাবনীয়।

ক. সর্বপ্রথম কে বিদ্যুৎশক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেন?
খ. 'এ যেন রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ'–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
গ. বিদ্যুৎকে রূপকথার আশ্চর্য প্রদীপ বলা হয়েছে কেন?–ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎতের ব্যবহার অভাবনীয়'–বিশ্লেষণ কর।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রেও ঘটে গেছে বিরাট পরিবর্তন। আমরা চাই কম খরচে বেশি বিদ্যুৎ। তার জন্য বিজ্ঞানীরা আজও গবেষণা করে চলেছেন। আর এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্পগুলো হচ্ছে বিরাট। এতে বহু লোক কাজ করছে বহুভাবে, যেন সন্ধানী মানুষের বিরাট কর্মশালা।

ক. 'রূপকথার সেই আশ্চর্য প্রদীপ'–এর রচয়িতা কে?
খ. বাড়িতে বিদ্যুৎ অপচয় রোধে তোমার করণীয় কী–লেখ।
গ. 'যেন সন্ধানী মানুষের বিরাট কর্মশালা'–উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ' আমরা চাই কম খরচে বেশি বিদ্যু'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বিদ্যুৎ বাতির উন্নতি সাধনের জন্য বহুলোক তাঁদের দক্ষতা ও সাধনা কাজে লাগিয়েছে। ড. আরভিং ল্যাঙ্গান প্রথম বাল্বে শূন্যতার বদলে চাপের ব্যবহার করেন। তিনিই সেই চাপ সহ্য করার জন্য সরু তারকে বাঁকিয়ে চাকতির মতো করেন। এরপর বাল্বের মধ্যে আরগন আর নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে দিয়ে আরও সুন্দর আলো পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে ফ্লোরোসেন্ট বাতির ব্যবহার খুব বেশি। এতে আলো ঠাণ্ডা হয়, বাল্ব উত্তপ্ত হয় কম। এগুলোকে টিউব লাইট বলে।

ক. বিদ্যুৎ বাতির উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান কার?
খ. ' শূন্যতার বদলে চাপের ব্যবহার করেন'–কথাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. সাধারণ বাতির ব্যবহারের চেয়ে টিউব লাইটের ব্যবহার বেশি কেন? আলোচনা কর।
ঘ. সরু তারকে বাঁকিয়ে চাকতির মতো করার পিছনে কী কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে কর। যুক্তিসহ তোমার মতামত তুলে ধর।

তৈলচিত্রের ভূত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



একদিন সকাল বেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে ঠিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে দিয়ে তার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, 'বোসো, নগেন।'

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে লিখে সেটি ডাকে পাটিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।

'বসতে বললাম যে? এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি?

নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চুরি করে কিনা, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের!'

গুরুতর কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দু হাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদ্‌ভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে।

নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে ছেলেটা এরকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোন দিন দিল না। বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনের আদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন।

নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ডাক্তার–কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ। পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে।'

'তবে–' দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার–কাকা, প্রেতাত্মা আছে?'

প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।'

'নেই? তবে–'

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনী। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।

মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল– শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ এক সময় তার মনে হল, সারা জীবন তো ভক্তিশ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য সত্যই ভক্তিশ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রমাণ করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।

রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্প দামি আর অনেক দিনের পুরোনো, ভিতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং উপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানা রকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা। টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তা ছাড়া কয়েকটা পুরোনো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে– কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে।

তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি।

কারো ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাচ–কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে 'আমায় ক্ষমা কর মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে–বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরো বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দু'চোখ বিস্ফারিত।

'তারপর?'

নগেন ঢোঁক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীরটা ঝনঝন করে উঠল তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি।

পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনো দিন ফিট হয়েছিল নগেন?'

নগেন মাথা নেড়ে বলল 'ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয় নি। আপনি ভুল করেছেন ডাক্তার–কাকা, এ ফিট নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তা হলে বুঝতে পারবেন।'

সমস্ত সকালটা নগেন মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসায় ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এখন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্বিধা–সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা। ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রমাণ করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন?

এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথার সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে?

নগেন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শান্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে। দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না।

এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিকটা পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির। ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ; চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীরটা হঠাৎ যেন কেমন অস্থির অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।

তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার।

ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলোটা থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে–

'ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার–কাকা।'

'অজ্ঞান হয়ে গেলে?'

'না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাই নি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়ে ছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার–কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কিসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে।'

পরাশর ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর আর কোনো দিন ছবিটা ছুঁয়েছে?'

'কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁয়ে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে। কোনো দিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনো দিন জ্ঞান থাকে।'

বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কী করব ডাক্তার-কাকা? এমন করে কদিন চলবে?'

পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।'

তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরোনো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগনে যে কাহিনী শুনিয়েছে, সারা দিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরো একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?

হয়-নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তার অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের উপরের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত।

ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল, 'আলোটা জ্বালব ডাক্তার-কাকা?'

পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন-'না।'

রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।

নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার-কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই-'

নগেনের শিহরন স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। 'ভয় পেয়ে গেছেন?'

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পিছন দিকে দু পা ছিটকে দিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন।

পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিল।

মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রূপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।

তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।'

রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতোমধ্যে রূপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্‌ব ফিট করা হয়েছে?

"আমি কি জানি! ছ'মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখানো তেমনি অবস্থাতেই আছে।'

'ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোনদেশি ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোন প্রেতাত্মা ভর করেছেন।'

নগেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'রূপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল. চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেক দিন আগে সিন্ধুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ।'

'হ্যাঁ। সে এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেব কেন?'

পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায়–'

নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার–কাকা–'

পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না, – ছবি মানে ছবির রূপার ফ্রেমটা। রূপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেক্ট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে 'লিকেজ' খুঁজতে হত। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে। সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে, আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই–'

পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসাবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না। তিনি হাঁফ ছাড়লেন। কপাল ভালো, তড়িতাহত হয়ে প্রাণে মরতে হয়নি।

লেখক পরিচিতি

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান। ১৯০৮ সালের ১৯শে মে তিনি সাঁওতাল পরগণার দুমপায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষের বসতি ছিল বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'টিকটিকি', 'হলুদ

পোড়া', 'হারানোর নাতজামাই' প্রভৃতি ছোটগল্পের জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। মানুষের মন বিশ্লেষণের দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। তিনি শ্রমিক–কৃষকের কল্যাণের কথাও ভেবেছেন।

তিনি 'মাঝির ছেলে' নামে একটি কিশোর–উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর কিশোর–উপযোগী গল্পের সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে 'কোথায় গেল?' 'জব্দ করার প্রতিযোগিতা', তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প', 'ভয় দেখানোর গল্প', 'সনাতনী', 'দাড়ির গল্প', 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

প্রকান্ড – অত্যন্ত বৃহৎ। অতিশয় বড়।

বিব্রত – ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল, বিচলিত।

উদ্‌ভ্রান্ত – বিহ্বল, দিশেহারা, হতজ্ঞান

খাপছাড়া – বেমানান, উদ্ভট, অসংলগ্ন, এলোমেলো।

শ্রান্ধ – মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য শ্রন্ধা নিবেদনের হিন্দু আচার বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান।

উইল – শেষ ইচ্ছেপত্র। মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বন্টন বিষয়ে মালিকের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত ব্যবস্থাপত্র বা দানপত্র যা তার মৃত্যুর পরে বলবৎ হয়।

প্রেতাত্মা – মৃতের আত্মা, ভূত।

অনুতাপ – আফসোস, কৃতকর্ম বা আচরণের জন্য অনুশোচনা, পরিতাপ।

তৈলচিত্র – তেলরঙে আঁকা ছবি।

প্রণাম – হাত ও মাথা দ্বারা গুরুজনের চরণ স্পর্শ করে অভিবাদন।

আত্মগ্লানি – নিজের ওপর ক্ষোভ ও ধিক্কার, অনুতাপ, অনুশোচনা।

বিস্ফারিত – বিস্তারিত, প্রসারিত, কম্পিত।

কস্মিনকালে – কোনো কালে বা কোনো কালেই।

ছলনা – কপটতা, শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ধোঁকা।

হৃৎকম্প – হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি।

মটকা – রেশমের মোটা কাপড়।

ভর্ৎসনা – তিরস্কার, ধমক,, নিন্দা।

ইতস্তত – দ্বিধা, সংকোচ, গড়িমসি।

অশরীরী – দেহহীন, শরীরহীন, নিরাকার।

ধড়াস – হৃৎস্পন্দনের শব্দ, ধড়ফড়।

পাঠ পরিচিতি

'তৈলচিত্রের ভূত' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কিশোর–উপযোগী ছোটগল্প। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ গল্পটি। ভূত–বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে তা তুলে ধরেছেন। এ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞানবুদ্ধির জয়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষ নানা অশরীরী শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষকে যদি বিজ্ঞান চেতনা দিয়ে ঘটনা বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তাহলে ওইসব বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ গল্পে নগেন–চরিত্রের মধ্যে ভূত–বিশ্বাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে পরাশর ডাক্তারের মধ্যকার বিজ্ঞানসম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন নগেনের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিহীনতাকে। মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূতে পরিণত হয়–এরকম বিশ্বাস সমাজে প্রচলিত থাকায় নগেন বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে সহজে বিশ্বাস করেছে।

অন্যদিকে পরাশর ডাক্তার সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করেন বলে তার কাছে বৈদ্যুতিক শকের বিষয়টি সহজেই ধরা পড়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভূত বিশ্বাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে কুসংস্কার বিরাজমান তা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য। বিজ্ঞান সম্মত বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এই কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সহজেই দূরকরা সম্ভব। গল্পটি পড়ে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে ভয়মুক্ত ও সচেতন হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রেতাত্মা মানে কী?
   - ক. ভ্রান্তি
   - খ. মৃত আত্মা
   - গ. ভূত
   - ঘ. নগেনের মামার আত্মা

২. 'মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে'– এটা কার উক্তি?
   - ক. ডাক্তারের
   - খ. মামার
   - গ. নগেনের
   - ঘ. দাদা মশায়ের

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৩–৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাগর মাঝে মাঝে রাতে ভয়ে জেগে উঠে। তার মনে হয় কোন ভূত তাকে তাড়া করছে। বিষয়টি সে কাউকে খুলে বলছে না। কিন্তু দিন দিন তার ভয় বাড়ছে এবং স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

৩. সাগরের ভয় পাওয়ার কারণ–
   - i. ভূতে তাড়া করা
   - ii. মানসিক অবস্থা
   - iii. অন্য কোন ভয় মনে পোষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. i ও ii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৪. এ অবস্থার উত্তরণে সাগর যা করতে পারে–
ক. ভয় না পাওয়া　　খ. রাতে জেগে থাকা
গ. দায়িত্বশীল কারোর সাহায্য নেওয়া　　ঘ. কাউকে না বলা

সৃজনশীল প্রশ্ন

সৌরভের পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না। প্রতিদিন রাতে পড়ার টেবিলের বাতির সুইচ টিপলেই তার শরীর ঝিম ঝিম করে উঠে। এতে তার মনে হয় তার পড়ার ঘরে কোন প্রেতাত্মা ভর করেছে এবং তাকে পড়তে বাধা দিচ্ছে। ফলে পড়াশুনায় তার মনোযোগ কমছে এবং তার শরীরও খারাপ হচ্ছে।

১. ক. প্রেত্মাতা মানে কী?
খ. মানুষ ভয় পায় কেন?
গ. সৌরভের ভয় পাওয়ার সংগত/বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সৌরভের ভয় পাওয়া এবং ‘তৈলচিত্র’ গল্পের নগেনের ভয় পাওয়ার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে–যুক্তিসহ মতামত দাও।



প্রথম দৃশ্য

(উকিল দুকড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন,
ভয়ে ভয়ে খাতা হস্তে কাঙালিচরণের প্রবেশ)

দুকড়ি। কী চাই?

কাঙালি। আজ্ঞে, মহাশয় হচ্ছেন দেশহিতৈষী।

দুকড়ি। তা তো সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি। আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ–

দুকড়ি। ওকালতি করে ব্যবসা চালাচ্ছি তাও কারও অবিদিত নেই– কিন্তু তোমার বক্তব্যটা কী?

কাঙালি। আজ্ঞে, বক্তব্য বেশি নেই।

দুকড়ি। তবে শীঘ্র সেরে ফেলো না। অনেক কথা শোনবার সময় নেই।

কাঙালি। তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে গানোন্নতি বিধায়িনী নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মহাশয়কে–

দুকড়ি। বক্তৃতা দিতে হবে?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। সভাপতি হতে হবে?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। তবে কী করতে হবে বলো। গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ দুটোর কোনোটা আমার দ্বারা কখনো হয় নি এবং হবেও না– তা আমি আগাম থাকতে বলে রাখছি।

কাঙালি। মহাশয়কে ও দুটোর কোনোটাই করতে হবে না। (খাতা অগ্রসর করিয়া) কেবল কিঞ্চিৎ চাঁদা–

দুকড়ি। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) চাঁদা। আ সর্বনাশ। তুমি তো সহজ লোক নও হে! ভালো মানুষটির মতো মুখ কাঁচুমাচু করে এসেছ– আমি বলি, বুঝি কি মকদ্দমার ফেসাদে পড়েছ। তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি।

কাঙালি। চাইলুম চাঁদা, পেলুম অর্ধচন্দ্র! (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জব্দ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(দুকড়িবাবু কতকগুলো সংবাদপত্র হস্তে)

দুকড়ি। এ তো বড় মজাই হল! কাঙালিচরণ বলে কে এক জন লোক ইংরেজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে, আমি তাদের 'গানোন্নতি বিধায়িনী সভায়' পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল– এতে আমার ব্যবসার পক্ষে ভারি সুবিধে। তাদেরও সুবিধে। লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েছে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারী ভারী চাঁদা আদায় হবে। যা হোক, আমার অদৃষ্ট ভালো।

(কেরানিবাবুর প্রবেশ)

কেরানি। মশায় তবে গানোন্নতি সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন?

দুকড়ি। (মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া) আর–ও একটা কথার কথা। শোন কেন? কে বললে দিয়েছি? মনে কর যদি দিয়েই থাকি তা, হয়েছে কী? এত গোলের আবশ্যক কী?

কেরানি। আহা, কী বিনয়! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। নিচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েছে।

দুকড়ি। (স্বগত) দেখেছ! একদিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের ওপরে নিয়ে আয়–আর পান তামাক দিয়ে যা।

(প্রথম ব্যক্তির প্রবেশ)

দুকড়ি। (চৌকি সরাইয়া) আসুন বসুন। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। ওরে–পান দিয়ে যা।

প্রথম। (স্বগত) আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি! এর কাছে কামনা সিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে।

দুকড়ি। মশায়ের কী অভিপ্রায়ে আগমন?

প্রথম। আপনার বদান্যতা দেশবিখ্যাত।

দুকড়ি। ওসব গুজবের কথা শোনেন কেন?

প্রথম। কী বিনয়! কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিলুম। আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল।

দুকড়ি। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে বললে হয়। বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশ্যে) তা, মশায়ের কী আবশ্যক?

প্রথম। দেশের উন্নতি–উদ্দেশ্যে হৃদয়ের–

দুকড়ি। আজ্ঞে, সেসব কথা বলাই বাহুল্য–

প্রথম। তা ঠিক। মশায়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি যাঁরা–

দুকড়ি। সমস্ত মানছি মশায়, অতএব ও অংশটুকুও ছেড়ে দিন। তার পরে–

প্রথম। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের গুণানুবাদ–

দুকড়ি। রক্ষে করুন মশায়, আসল কথাটা বলুন।

প্রথম। আসল কথা কি জানেন– দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে।

দুকড়ি। দুঃখের বিষয়।

প্রথম। তাই একটা সভা।

দুকড়ি। (সচকিত) সভা।
প্রথম। এই দেখুন না খাতা।
দুকড়ি। (বিস্ফারিত নেত্রে) খাতা!
প্রথম। কিঞ্চিৎ চাঁদা–
দুকড়ি। (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা, বেরোও–বেরোও বেরোও– (তাড়াতাড়ি চৌকি– উলটায়ন, কালি–ফেলন, প্রথম ব্যক্তির বেগে প্রস্থানোদ্যম, পতন, উত্থান, গোলমাল)

(দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ)

দুকড়ি। কী চাই?
দ্বিতীয়। মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা–
দুকড়ি। ওসব হয়ে গেছে– হয়ে গেছে, নতুন কিছু থাকে তো বলুন।
দ্বিতীয়। আপনার দেশহিতৈষিতা–
দুকড়ি। এ তো বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বলুন।
দ্বিতীয়। একটা সভা–
দুকড়ি। আবার সভা।
দ্বিতীয়। এই দেখুন না খাতা।
দুকড়ি। খাতা! কিসের খাতা?
দ্বিতীয়। চাঁদা আদায়–
দুকড়ি। চাঁদা। (হাতে ধরিয়া টানিয়া) ওঠো, বেরোও–বেরোও–প্রাণের মায়া থাকে তো– (দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান)

(তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ)

দুকড়ি। দেখ বাপু, আমার দেশহিতৈষিতা, বদান্যতা, বিনয় এ সমস্ত শেষ হয়ে গেছে– তার পর থেকে আরম্ভ কর।
তৃতীয়। আপনার সার্বভৌমিকতা–সার্বজনীনতা–উদারতা–
দুকড়ি। তবু ভালো, এ কিছু নতুন ঠেকছে বটে। কিন্তু মশায় ওগুলোও থাক, আসল কথা আরম্ভ করুন।
তৃতীয়। আমাদের একটা লাইব্রেরি–
দুকড়ি। লাইব্রেরি। সভা নয় তো?
তৃতীয়। আজ্ঞে, সভা নয়।
দুকড়ি। আ! বাঁচা গেল। লাইব্রেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যান।
তৃতীয়। এই দেখুন না প্রসপেক্টস–
দুকড়ি। খাতা নেই তো?
তৃতীয়। আজ্ঞে না, খাতা নয়, ছাপানো কাগজ।
দুকড়ি। আ! তার পরে?
তৃতীয়। কিঞ্চিৎ চাঁদা।
দুকড়ি। (লাফাইয়া) চাঁদা। ওরে আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে। পুলিশম্যান! পুলিশম্যান!

(তৃতীয় ব্যক্তির ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন)

(হরশংকর বাবুর প্রবেশ)

দুকড়ি। আরে এসো, এসো, হরশংকর এসো। সেই কলেজে একসঙ্গে পড়া– তার পরে তো আর দেখা হয় নি। তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হল সে আর কী বলব!

হরশংকর। তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা আছে ভাই– সেসব কথা পরে হবে, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

দুকড়ি। (পুলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শুনি নি ভাই–বলো, শুনে কান জুড়োক। (শালের মধ্য হইতে খাতা বাহিরকরণ) ও কী ও, খাতা বেরোয় যে!

হরশংকর। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা–

দুকড়ি। (চমকিত হইয়া) সভা!

হরশংকর। সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্য।

দুকড়ি। চাঁদা! দেখো, তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের প্রণয়, কিন্তু ওই কথাটা যদি আমার সামনে উচ্চারণ কর তা হলে চিরকালের মতো চটাচটি হবে তা বলে রাখছি।

হরশংকর। বটে! তুমি কোথাকার 'গানোন্নতি সভায়' পাঁচ হাজার টাকা দান করতে পার, আর বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখানে আর পদার্পণ করে। (সবেগে প্রস্থান)

(খাতা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ)

দুকড়ি। খাতা? আবার খাতা? পালাও পালাও।

খাতাবাহক। (ভীত হইয়া) আমি নন্দলাল বাবুর।

দুকড়ি। নন্দলাল ফন্দলাল বুঝি নে, পালাও এখনি।

খাতাবাহক। আজ্ঞে, সেই টাকাটা।

দুকড়ি। আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও বেরোও। (খাতাবাহকের পলায়ন)

কেরানি। মশায়, করলেন কী? নন্দলাল বাবুর কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেছে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চলবে না।

দুকড়ি। কী সর্বনাশ! ওকে ডাকো ডাকো।

(কেরানির প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ)

কেরানি। সে চলে গেছে, তাকে পাওয়া গেল না।

দুকড়ি। বিষম দায় দেখছি!

(তম্বুরা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ)

দুকড়ি। কী চাও?

তম্বুরা। আপনার মতো এমন রসজ্ঞ কে আছে? গানের উন্নতির জন্য আপনি কী না করছেন। আপনাকে গান শোনাব। (তৎক্ষণাৎ তম্বুরা ছাড়িয়া গান)

জয় জয় দুকড়ি দত্ত
ভুবনে অনুপম মহত্ত্ব ইত্যাদি–

দুকড়ি। আরে, কী সর্বনাশ!

(তম্বুরা হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ)

দ্বিতীয়। ও গানের কী জানে মশায়? আমার গান শুনুন।

দুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য,
তব মহিমা কে জানিবে অন্য।

দুকড়ি। (কানে আঙুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম!
(বাঁয়া–তবলা লাইয়া বাদকের প্রবেশ)
বাদক। মশায়, সংগত নেই গানে। সে কি হয়!
(বাদ্য আরম্ভ)
(দলে দলে গায়ক, বাদক ও খাতা হস্তে চাঁদাওয়ালার প্রবেশ)
প্রথম। মশায় গান
দ্বিতীয়। মশায় চাঁদা
তৃতীয়। মশায় সভা
চতুর্থ। আপনার বদান্যতা
পঞ্চম। ইমন কল্যাণের খেয়াল
ষষ্ঠ। দেশের মঙ্গল
সপ্তম। সরি মিঞার টপ্পা–
অষ্টম। আরে, তুই থাম না বাপু
নবম। আমাদের কথাটা বলে নিই, একটু থাম না ভাই।
(সকলে মিলিয়া দুকড়ির চাদর ধরিয়া টানাটানি, শুনুন মশাই, আমার কথা শুনুন মশাই ইত্যাদি।)
দুকড়ি। (সকাতরে কেরানির প্রতি) আমি মামার বাড়ি চললুম। কিছুকাল সেখানে গিয়ে থাকব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না। (প্রস্থান)

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি জ্ঞানসাধনায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি সাহিত্যসাধনা শুরু করেন এবং কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজসেবক হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি শাখাতেই তাঁর অবদানের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। তাঁর সমকালীন যুগকে রবীন্দ্রযুগ বলে অভিহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনার মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ইত্যাদি। তাঁর প্রায় সব গল্পই 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলো হল– 'বৌ ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। তাঁর নাটক ও প্রহসন– 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গাদা', 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী', 'চিরকুমার সভা', 'হাস্যকৌতুক', 'শ্যামা' ইত্যাদি। প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদান রয়েছে (রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য কাব্যের উল্লেখ রয়েছে 'দুরন্ত আশা' কবিতার আলোচনার শেষে)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

শব্দার্থ

খ্যাতি – সুনাম।
বিড়ম্বনা – দুর্গতি।
হিতের – মঙ্গালের।
অবিদিত – অজানা।
হস্তে – হাতে।
দেশহিতৈষী – দেশের হিত বা কল্যাণ কামনাকারী।
শ্রুত – শোনা।
প্রস্থানোদ্যম – চলে যাওয়ার উপক্রম।

বক্তব্য – বলার বিষয়।
গানোন্নতি – গানের উন্নতি।
কিঞ্চিৎ – কিছু।
ফেসাদে – বিপদে।
অর্ধচন্দ্র – গলাধাক্কা।
অদৃষ্ট – ভাগ্য।
গোলের – গোলযোগের।
স্বগত – নিজে নিজে বলা
পসার – খ্যাতি।
সানন্দে – আনন্দের সঙ্গে।
অমায়িক – বিনীত, ভদ্র।
গুণানুবাদ – গুণের কথা।
অধোগতি – অবনতি।
বিস্ফারিত নেত্র – বড় করে মেলা চোখ।
প্রকৃতি – স্বভাব।
সিদ্ধি – সফল।
অভিপ্রায় – ইচ্ছা।
বদান্যতা – দানশীলতা, উদারতা।
প্রসপেক্টাস (Prospectus)– নিয়মাবলির বিবরণ।
পুলকিত – আনন্দিত।
প্রণয় – ভালোবাসা।
পাষণ্ড – পাপিষ্ঠ।
নরাধম – অমানুষ।
তম্বুরা – তানপুরা, বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
রসজ্ঞ – রসজ্ঞানসম্পন্ন।
অনুপম – তুলনাহীন।
সংগত – গানের সঙ্গে বাজনার মিল।
তবলা – একদিকে চামড়ায় ঢাকা বাদ্যযন্ত্র।
ইমন কল্যাণ – গানের একটি রাগিণী।
সার্বভৌমিকতা – সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব। সার্বভৌম বলতে যার ওপর কারও কর্তৃত্ব নেই এমন বোঝায়।
সার্বজনীনতা – সকলের জন্য হিতকর।
টপ্পা – গান বিশেষ।
সরি মিঞা – সেকালের এক জন খ্যাতনামা টপ্পাগায়ক।

পাঠ-পরিচিতি

'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাস্যকৌতুক' গ্রন্থ হেকে গৃহীত হয়েছে।

নাটিকাটি হাস্যরসাত্মক। নাটিকার প্রধান চরিত্র দুকড়ি দত্ত। তাকে নিয়েই কৌতুক। দুকড়ি পেশায় উকিল। তার পসার যথেষ্ট, কিন্তু সে খুব স্বার্থপর। অর্থের প্রতি তার লালসা প্রবল, আর সে অহংকারী। তার খ্যাতির বেশ মোহ আছে। অথচ দানে সে কৃপণ। সে চাটুকারিতা পছন্দ করে। কিন্তু বিনিময়ে সামান্য চাঁদা দিতেও রাজি নয়। তাই সমাজের কেউ কেউ তার প্রতি অসন্তুষ্ট। কাঙালিচরণ দুকড়িকে জব্দ করতে চায়। দুকড়ির খ্যাতির লোভকে সে কাজে লাগায় এবং এর মাধ্যমে তাকে বিড়ম্বিত করে। খবরের কাগজে দুকড়ি তার কল্পিত দানের সংবাদ ও প্রশংসা শুনে খুশি হয়। কিন্তু চাঁদাপ্রার্থীরা এসে তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। সে বুঝতে পারে সস্তা খ্যাতির মোহ তার জন্য কতই না বিড়ম্বনা নিয়ে এসেছে।

পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে বলে উকিল দুকড়ির যে সুনাম ছড়িয়ে গেছে তাতে আকৃষ্ট হয়ে চাঁদা নিতে এসেছে দেশ উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, বিচিত্র সভাসমিতির কর্মকর্তা, লাইব্রেরির উদ্যোক্তা, বাল্যকালের সহপাঠী, গায়ক, বাদক–সবার হাতে চাঁদার খাতা। দুকড়ি চাঁদাপ্রার্থীদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত মামার বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে খ্যাতিলাভের সহজ পথ ধরতে গিয়ে দুকড়িকে বিড়ম্বিত হতে হল।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই নাটিকাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা এর মূল বক্তব্য অনুধাবন করবে এবং শ্রেণীকক্ষে নাটিকাটি অভিনয় করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. খ্যাতির বিড়ম্বনা গল্পটি

ক. ব্যাঙ্গাত্মক
খ. বিয়োগান্তক
গ. হাস্যরসাত্মক
ঘ. ঐতিহাসিক

২. হরশংকর বাবু দুকড়ির কে?

ক. একজন পাওনাদার
খ. সহপাঠী
গ. প্রতিবেশী
ঘ. মক্কেল

৩. 'ওরে আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে'–দুকড়ির এমন উক্তির কারণ–

i. বাড়িতে সত্যিই ডাকাত পড়েছিল
ii. দলে দলে লোক চাঁদা চাইতে এসেছিল
iii. চাঁদা চাইতে আসা লোকদের ভয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. iii
গ. ii
ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এ তো বড় মজাই হল। কাঙালিচরণ বলে কে একজন লোক ইংরেজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে, আমি তাদের 'গানোন্নতি বিধায়িনী সভায়' পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল–এতে আমার ব্যবসার পক্ষে ভারি সুবিধে।

ক. উদ্ধৃত অংশটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন লেখা থেকে নেওয়া?
খ. কাঙালিচরণ চাঁদা না পেয়েও খবরের কাগজে কেন চাঁদা পাওয়ার কথা লিখেছিল?–ব্যাখ্যা কর।
গ. খবরের কাগজে চাঁদা দেয়ার খবর ছাপা হওয়ায় দুকড়ি কী অবস্থায় পড়েছিল–তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর খবরের কাগজে চাঁদার কথা ছাপা হওয়ায় দুকড়ি বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জাহিদ হাসান বাংলাদেশের একজন পরিচিত অভিনেতা। রিকশায় করে কেনাকাটা করতে আসেন। ব্যাস আর যায় কোথায়, ভক্তরা সব ঘিরে ধরে। কেউবা কুশল বিনিময় করে, কেউ সামনে থেকে দেখতে আসে। কেউবা অটোগ্রাফ চায়। ক্রমে ভিড় বাড়তে থাকে। ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েন তিনি। ভিড় সামলাতে ব্যর্থ হয় মার্কেটের নিরাপত্তা কর্মীরা। এক পর্যায়ে তিনি একটি দোকানে ঢুকে পড়েন। দোকানের সামনে ভিড় জমে শ শ জনতার। জনতার উৎসাহ আরও বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে নিরাপত্তা কর্মীদের বাঁশির হুইসেল।

ক. খ্যাতির বিড়ম্বনা নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম কী?

খ. তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী?

গ. উদ্ধৃত অংশে যে মূলভাব ব্যক্ত করা হয়েছে তা তোমার পঠিত 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটকের মূলভাবের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাহিদ হাসানের পরিণতির সঙ্গে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'র মূল চরিত্রের মিল–অমিল তুলে ধর।

প্রতিবন্ধিতা ও তার প্রতিকার

নিরঞ্জন অধিকারী



শফি, গনি, শিবু, পারমিতা আর মেরি। ওরা পাঁচ পরিবারের পাঁচ জন। একই পাড়ায় থাকে। তোমাদের মতোই কিশোর–কিশোরী।

শফি কী ফরসা! মুখখানা মায়াভরা। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু জন্ম থেকে ওর ডান পা বাম পা থেকে ছোট আর সরু। কেমন শুকনো–শুকনো। ঠিকমতো হাঁটতে পারে না।

গনির ব্যাপারটা অন্যরকম। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনায় ওর চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে ও চোখে দেখতে পায় না।

এবারে শিবুরটা শোনো। একদিন ঝড় হচ্ছিল। সঙ্গে ছিল মেঘের গুড়গুড় । হঠাৎ ওদের পাশের ঘরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। তার পর থেকে শিবু কিছুই শুনতে পায় না।

পারমিতা ফুটফুটে এক মেয়ে। হাসি–খুশি মুখ। কেউ দেখে বলতেই পারবে না ওর কোনো সমস্যা আছে। কিন্তু সমস্যা হল, ও কথা বলতে পারে না।

মেরির ব্যাপারটা আরও দুঃখের। ওর দেহের বয়স বাড়লেও ওর মনের বয়স বাড়েনি। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। ওর বয়স চার–পাঁচ বছর। কথা বোঝা ও বলার ক্ষেত্রে অন্য সকলের মতো ওর স্বাভাবিক ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। বসা, দাঁড়ানো ও চলাফেরা শিখতে সাধারণ সময়ের চেয়ে বিলম্ব হয়েছে। স্মৃতির ক্ষেত্রেও ওর দুর্বলতা রয়েছে। অর্থাৎ শুনে মনে রাখতে পারে না। এরকম আরও কিছু সমস্যা। এক কথায়, মেরির বুদ্ধির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

এরকম শরীর, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক বা কথা বলা, আর বুদ্ধির ক্ষেত্রে যারা স্বাভাবিক নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, তাদেরকে এক কথায় বলা হয় প্রতিবন্ধী। আর এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী অস্বাভাবিকতা ও সীমাবদ্ধতাকে বলা হয় প্রতিবন্ধিতা।

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হল: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলেন তাঁরা, যাঁদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়গত ক্ষতি হয়েছে; আর এ ক্ষতি নানা প্রকার প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে এবং সমাজের অন্যদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

মোট কথা, কোনো ব্যক্তি দীর্ঘস্থায়ী অসমর্থতার কারণে সমাজ বা পরিবেশে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাকে প্রতিবন্ধিতা বলে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে–কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক সমস্যাই প্রতিবন্ধিতা নয়। কোনো কারণে

সাময়িকভাবে কেউ প্রতিবন্ধী হতে পারে। তা চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু প্রতিবন্ধিতা কখনও একেবারে সারে না। সেবা, শিক্ষা ও চিকিৎসার দ্বারা তার তীব্রতার মাত্রা কমানো যায় মাত্র। প্রতিবন্ধীকে জীবনযাপনে কিছুটা স্বাবলম্বী করে তোলা যায় এবং তাকে সমাজের স্বাভাবিক জীবনধারায় অংশীদার করা যায়।

প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ

আক্রান্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বা সীমাবদ্ধতার ধরন অনুসারে প্রতিবন্ধিতা নানা প্রকার হতে পারে। প্রধান প্রতিবন্ধিতাগুলো হচ্ছে :

১. শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, ২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, ৩. শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, ৪. বাক প্রতিবন্ধিতা, ৫. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা।

আমরা যে পাঁচজন কিশোর–কিশোরীর কথা একটু আগে বলেছি, তাদের মধ্যে শফি শারীরিক প্রতিবন্ধী। গনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শিবু শ্রবণ প্রতিবন্ধী, পারমিতা বাক প্রতিবন্ধী এবং মেরি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। মেরির বয়স অনুপাতে কর্ম সম্পাদনে ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতির তারতম্য বা মাত্রা অনুসারে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের আবার চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :

ক) মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, খ) মধ্যম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, গ) গুরুতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং ঘ) চরম বুদ্ধি প্রতিবন্ধী।

তবে শুধু বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাই নয়, উল্লিখিত অন্যান্য প্রতিবন্ধিতাও নানা ধরনের হতে পারে। কাউকে একসাথে একাধিক প্রতিবন্ধিতা আক্রমণ করলে তাকে বহুমুখি প্রতিবন্ধী বলা হয়। একে মিশ্র প্রতিবন্ধীও বলা যেতে পারে।

আরও এক রকমের প্রতিবন্ধিতা আছে, যার নাম অটিজম (Autism) । অটিজম হল আচরণের বিশেষ ধরনের ঘাটতি, যার জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয়। অটিজম–এ আক্রান্ত শিশু বাবা–মা বা পরিবারের অন্যদের বা সমাজের অন্য লোকদের সঙ্গে তেমনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিজের মনে একই কাজ বা একই খেলা বারবার করতে থাকে। এও এক প্রকার জটিল ধরনের প্রতিবন্ধিতা।

প্রতিবন্ধিতার কারণ :

প্রতিবন্ধিতা নানা কারণে হয়ে থাকে। তবে আমরা প্রধানত তিনটি কারণ চিহ্নিত করতে পারি :

(১) বংশগত: বংশগতভাবে একজন শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মাতে পারে।

(২) গঠনগত: শিশুর শরীরের কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি কিংবা স্নায়ুতন্ত্র কোনো রোগ, দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একে বলে গঠনগত ত্রুটি।

(৩) পরিবেশগত: শিশুর পরিবেশ অনেক সময় তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সহায়ক হয় না। অর্থাৎ প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিশুর দেহ ও মনে নানারকম ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

প্রতিবন্ধিতা ও আমাদের করণীয় :

আগেই বলেছি, প্রতিবন্ধিতা সম্পূর্ণ ভালো হয় না। তাই সমাজের অনেকে তাদের অবহেলার চোখে দেখে। অনেকে তাদের লজ্জার কারণ বলে ভাবেন। সমাজের অনেকে মনে করে, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা। এ ধারণা একেবারেই অযৌক্তিক, অন্যায় ও অমানবিকও বটে। এজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা দরকার। দরকার মানসিকতার পরিবর্তন।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের আমরা সেবা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম করে তুলতে পারি। আমরা এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি হেলেন কেলারের কথা। হেলেন কেলার মাত্র আঠারো মাস বয়সে অন্ধ ও বধির হয়ে যান। কিন্তু উপযুক্ত সেবা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁর উন্নতি ঘটে। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নিয়েও স্টিফেন হকিং একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ১৯৯৬ সালে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ অলিম্পিক্স–এ বাংলাদেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন ইভেন্ট–এ পাঁচটি স্বর্ণপদকসহ বেশ কয়েকটি পদক জয় করে এনেছে। ২০০৭ সালে অক্টোবর মাসে চীনের সাংহাই শহরে অনুষ্ঠিত গ্রীষ্মকালীন বিশেষ অলিম্পিক্স–এ বাংলাদেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ক্রীড়াদল ১৬২টি দেশের প্রায় ১০ হাজার প্রতিযোগীর

সাথে প্রতিযোগিতা করেছে। এ প্রতিযোগিতায় তারা ৩২টি স্বর্ণ, ১৯টি রৌপ্য ও ১৫টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে।

সুতরাং প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, বরং তাদের জন্য দরকার সেবা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ।

প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নততর চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণপদ্ধতি বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য 'ব্রেইল পদ্ধতি' নামে এক ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয়।

মূক ও বধির অর্থাৎ বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য 'ইশারা ভাষা' ব্যবহার করা হয়। ইশারা ভাষা হচ্ছে ঠোঁট ও হাতের নির্দিষ্ট ভঙ্গির মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা। একেক ভঙ্গি দিয়ে এক–একটি বর্ণ তৈরি করা হয়। বর্ণগুলো দিয়ে ইশারায় বানানো হয় শব্দ ও বাক্য।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরও তাদের উপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে। যেমন, যার পা আক্রান্ত, তাকে হাতের কাজ শেখানো হয়।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সমস্যা বেশি। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নানা সংগঠন–সমিতি রয়েছে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের পৃথক করে রাখা উচিত নয়। তাতে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তারা শেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। সুতরাং সাধারণ বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে জাতিসংঘ

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে জাতিসংঘও এখন সচেতন। ২০০৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ 'প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদ' গ্রহণ করেছে। তাতে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা, সর্বক্ষেত্রে সুযোগের সমতা, নারী–পুরুষ সমতা, প্রতিবন্ধিতাকে মানুষেরই এক ধরনের বৈচিত্র্য হিসেবে দেখা, প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘ ৩রা ডিসেম্বর তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র এ দিনটিকে প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে পালন করে। তারা এদিন র‍্যালি, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, সংগীত, নাচ, অভিনয় প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রতিবন্ধীরাও অংশগ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিতা ও তার প্রতিকার

২০০৫ সালের এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫.৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীবিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এ নীতিমালায় প্রতিবন্ধীদের জন্য কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আজকাল সরকারের পাশাপাশি বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যেমন– জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অব দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিজঅ্যাবল্ড (সুইড), বাংলাদেশ ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি দয়া বা করুণা নয়, তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান দিতে হবে। আমরা যেন তাদের খোঁড়া, ল্যাংড়া, অন্ধ, বোবা, বয়রা বা পাগল বলে উপহাস না করি, কিংবা তাদের যেন পরিবার বা সমাজের বোঝা মনে না করি। আমরা যেন তাদেরকে সমাজের আর দশজন মানুষ থেকে আলাদা করে না দেখি।

স্বাভাবিক শিশুরা ওদের নিয়ে খেলবে। বিভিন্ন দিবসে অনুষ্ঠিত গানে, নাটকে, নাচে এবং অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজে ওদেরও অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেবে, এটাই সমাজের প্রত্যাশা।

আমরা সবসময় মনে রাখব, প্রতিবন্ধীদের প্রতি উষ্ণ ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেওয়া, তাদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ নয়, এটা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও ন্যায্য অধিকার।

লেখক-পরিচিতি

নিরঞ্জন অধিকারী ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলার বিনোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নীতিশচন্দ্র অধিকারী। মাতা রেণুকা দেবী। নিরঞ্জন অধিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বি. এ. অনার্স (১৯৭০) ও এম. এ. ডিগ্রি (১৯৭১) এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি (১৯৭৬) অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি জার্মান ভাষায়ও ডিপ্লোমা (১৯৮৮) অর্জন করেছেন। কর্মজীবনে তিনি এক সময় সাংবাদিকতা করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন এবং তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। নিরঞ্জন অধিকারী নাটক, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের সকল শাখাতেই লেখনী চালনা করেন। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে 'নিছক আনন্দ নয়' (কাব্যগ্রন্থ), 'এই পথ অন্য পথ', 'নয়া পাড়ায় পুরান মিয়া'(নাটক), 'সাহিত্য সংস্কৃতির দর্পণে স্বদেশের অবয়ব' (প্রবন্ধ) ইত্যাদি।

এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য চল্লিশটিরও অধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তিনি একজন নাট্যকর্মী, নাটক ও আবৃত্তির নির্দেশক ও প্রশিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক ও শিশুকিশোর সংগঠনের নিরলস সংগঠক। তিনি নরেন বিশ্বাস স্মৃতি পদক, অশ্বঘোষ স্মৃতি পুরস্কার (ভারত) সহ বহু পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন।

শব্দার্থ

অসমর্থতা – অপারগতা।

স্বাবলম্বী – নিজের ওপর নির্ভরতা। নিজের কাজ নিজে করতে পারা।

নিরাময় – সমস্যা বা রোগ–ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া, আরোগ্য।

চিত্তবিনোদন – মনে আনন্দ হয় এমন কাজ বা অনুষ্ঠান।

অমানবিক – মানুষের করা উচিত নয়, এমন কাজ।

বিচ্ছিন্ন – আলাদা।

বৈষম্য – সমতার অভাব।

উপহাস – ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

টীকা

প্রতিবন্ধিতা – বাধা পাওয়ার বিষয় বা ঘটনা। এখানে প্রতিবন্ধিতা বা প্রতিবন্ধী শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হল, শরীরের বা বুদ্ধির দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি।

সাধারণের চেয়ে বিলম্ব – প্রত্যেকটি শিশুর হাঁটা, কথা বলা, ভাষা প্রভৃতি শেখা এবং মা–বাবাসহ অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কমবেশি একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। তার চেয়ে বেশি বিলম্বকে এখানে সাধারণের চেয়ে বেশি বিলম্ব বলা হয়েছে।

জাতিসংঘ – বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেকার শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৪৫ সালে ২৪শে অক্টোবর। এ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'United Nations Organization', সংক্ষেপে ইউএনও (UNO)। উল্লেখ্য, এখানে কোনো ব্যক্তি সদস্য হতে পারেন না। এক–একটি রাষ্ট্র এর সদস্য হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ বছরের বিভিন্ন দিবসকে বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। যেমন, ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস ইত্যাদি।

জাতীয় নীতিমালা – প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন বিষয়ে করণীয় নীতিমালা ঘোষণা করে জনগণকে জানায় এবং ঐ নীতিমালা বাস্তবে প্রয়োগ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের একীভূত শিক্ষা – বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের একীভূত শিক্ষা বলতে বোঝানো হয়েছে একই শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে সুস্থ ও প্রতিবন্ধী শিশুদের একসঙ্গে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা।

হেলেন কেলার (জন্ম ১৮৮০–মৃত্যু ১৯৬৮) – উত্তর আমেরিকার আল্‌বাসার তুস্‌কাম্বিয়ায় জন্ম। পিতা ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার। মাত্র আঠারো মাস বয়সে মারাত্মক অসুখে পড়ে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়ে যান। অন্ধ ও বধির হলেও হেলেন কেলারের ছিল অত্যন্ত মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি। প্রতিবন্ধী হয়েও হেলেন কেলার ম্যাসফিল্ড সুলিভান ও মিস ফুলারের মতো শিক্ষকদের সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অর্জন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। তিনি 'দি স্টোরি অব মাই লাইফ' নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছেন।

স্টিফেন হকিং (জন্ম– ৮ই জানুয়ারি, ১৯৪২)– যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ডে জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নর্থ লন্ডনে। তাঁর পূর্ণ নাম স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। পিতা ফ্র্যাংক হকিং ও মাতা ইসোবেল হকিং। স্টিফেন হকিং প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। মারাত্মক গঠনগত প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হয়েও তিনি পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না, চলাফেরার জন্য একটি হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন। তিনি স্বাভাবিক উপায়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না। একটি কম্পিউটারের সাহায্যে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেন। কম্পিউটারটি তাঁর হুইল চেয়ারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম', 'ব্ল্যাক হোল্‌স অ্যান্ড বেবি ইউনিভার্সেস' তাঁর লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক দুটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ।

পাঠ-পরিচিতি

প্রতিবন্ধিতা একটি সামাজিক ও মানবিক সমস্যা। প্রতিবন্ধিতা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য নয়। তবে সেবা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিবন্ধীদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটানো যায় এবং তাদের স্বাবলম্বীও করে তোলা যায়। বর্তমান পাঠে প্রতিবন্ধিতা কাকে বলে, প্রতিবন্ধী কারা, প্রতিবন্ধিতা কত প্রকার, প্রতিবন্ধিতার কারণ, তার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা, প্রতিকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে জাতিসংঘ, বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের আলাদা করে না রেখে সমাজের মূল স্রোতধারায় তাদের একীভূত করার কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতিবন্ধীদের প্রতি ভালো আচরণ কোনো সুযোগ নয়, এটা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিবন্ধিতা ও প্রতিবন্ধী বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার প্রতিকারে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে উৎসাহিত করাই বর্তমান পাঠের উদ্দেশ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. জাতিসংঘের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধীব্যক্তির শারীরিক মানসিক, বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়গত ক্ষতি

ক. স্বল্পকালীন খ. দীর্ঘমেয়াদি
গ. সাময়িক ঘ. আজীবন

নিচের অংশটুকু পড় এবং ২–৪ নং প্রশ্নের দাও।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধীদিবসে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র র‍্যালি, আলোচনা সভা, নাচ-গান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধরাও অংশগ্রহণ করে। প্রতিবন্ধদের এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা বিরাজমান।

২. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস কোনটি?

ক.	৩রা ডিসেম্বর	খ.	১৩ই ডিসেম্বর
গ.	২৫ই মার্চ	ঘ.	১লা এপ্রিল

৩. আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালনের উদ্দেশ্য

i. প্রতিবন্ধদের চিকিৎসা করা
ii. প্রতিবন্ধদের আনন্দ দেয়া
iii. প্রতিবন্ধদের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.	i	খ.	ii
গ.	ii ও iii	ঘ.	iii

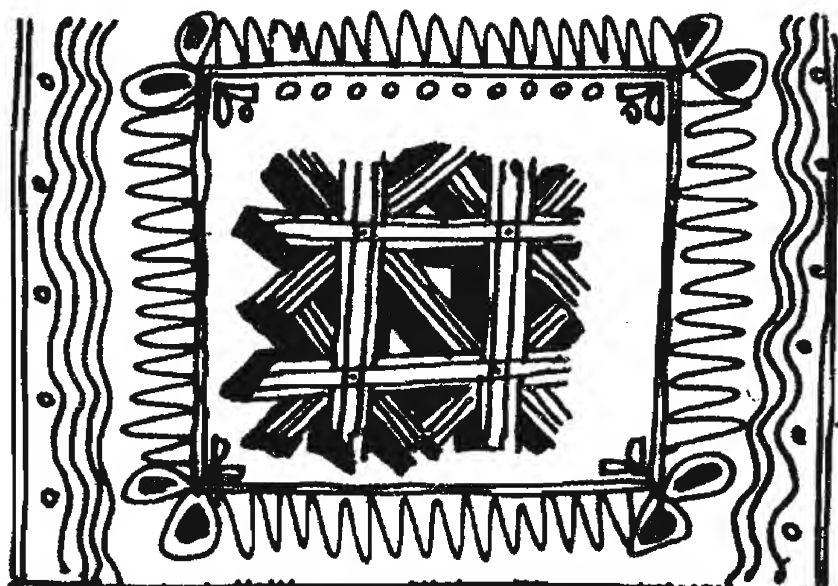
৪. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধরা–

ক.	আরোগ্য লাভ করতে পারে	খ.	অধিকার আদায় করতে পারে
গ.	সামাজিক স্বীকৃতি পেতে পারে	ঘ.	মানুষকে আনন্দ দিতে পারে

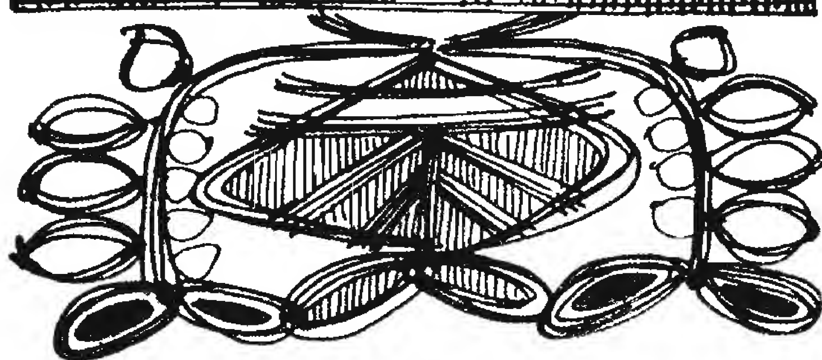
সৃজনশীল প্রশ্ন

রুমির জন্মের পর থেকে মানসিক বিকলাঙ্গতার শিকার। এ কারণে সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে কর্মদক্ষ হয়ে ওঠে সে তা অর্জন করতে পারেনি। পরিবারের সকলে তাকে উপেক্ষা করে। বাবা–মায়ের প্রকৃত আদর থেকেও সে বঞ্চিত। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধীদিবসে টেলিভিশনের একটি আলোচনা রুমিসহ তার পরিবারের সদস্যগণ উপভোগ করে। অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য, তাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এর পর থেকে পরিবারের সদস্যগণ রুমির প্রতি স্নেহ–ভালোবাসাসুলভ আচরণ করতে থাকে। এতে রুমি ধীরে ধীরে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সংসারের কিছু কিছু কাজ সে করতে শেখে।

ক. রুমি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না কেন?
খ. রুমিকে পরিবারের সদস্যগণ উপেক্ষা করার কারণ বর্ণনা কর।
গ. রুমিকে কি স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব?
ঘ. প্রতিবন্ধিকতা প্রতিরোধে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

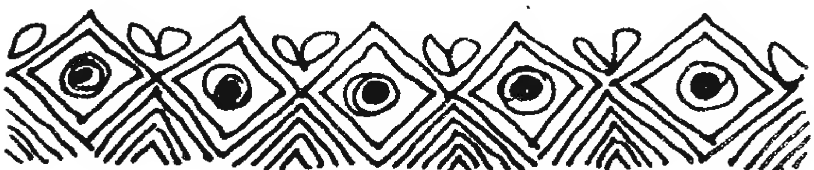



কাঁথা









প্রার্থনা

কায়কোবাদ

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলি নি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর পথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণগানে,
আনন্দে বিহ্বল!
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফল!
দেহ হৃদে বল!

বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকানল!
দেহ হৃদে বল!

(সংক্ষেপিত)

কবি-পরিচিতি

কায়কোবাদ ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মুহম্মদ কাজেম আল কুরায়শী। প্রবেশিকা পর্যন্ত লেখাপড়া করে তিনি ডাক বিভাগে চাকরি নেন। অনেক দিন ধরে তিনি নিজগ্রাম আগলাতেই পোস্টমাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন। ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় তাঁর হাতেখড়ি হয়। তারপর আপন স্বভাবে তিনি ক্রমাগত লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'মহাশ্মশান' বিখ্যাত মহাকাব্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অশ্রুমালা, শিবমন্দির, অমিয়ধারা, মহররম শরীফ ইত্যাদি।
১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কবি কায়কোবাদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

প্রার্থনা – মুনাজাত, আবেদন।
বিভো – বিভু, স্রষ্টা, এখানে 'বিভো' বলে কবি স্রষ্টাকে সম্বোধন করেছেন।
রিক্ত করে – শূন্য হাতে।
পেষণে – অত্যাচারে।
ক্রোড় – কোল।
পল – মুহূর্তকাল, নিমেষ।
অশেষ – যার শেষ নেই, অন্তহীন।
বিষাদ – বিষণ্নতা, দুঃখবোধ।
স্মরিলে – স্মরণ করলে, মনে করলে।
প্রসাদ – অনুগ্রহ।
হৃদে – হৃদয়ে, মনে।
বল – শক্তি, জোর।
স্তুতি – প্রশংসা।
আরতি – প্রার্থনা।
চারু – সুন্দর।
নিকুঞ্জ – বাগান।
শোকানল – শোকরূপ অনল, যে শোক হৃদয়কে দগ্ধ করে।

পাঠ-পরিচিতি

'প্রার্থনা' কবিতাটি কবির 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। কবি এ কবিতায় স্রষ্টার অপার মহিমার কথা বর্ণনা করে স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কবি ভক্তি বা প্রশংসা করতে না জেনেও কেবল চোখের জলে নিজেকে নিবেদন করেন। বিপদে, আপদে, সুখে, শান্তিতে সব সময় তিনি বিধাতার কাছ থেকে শক্তি কামনা করেন। গাছে গাছে পাখি, বনে বনে ফুল সবই বিধাতাকে স্মরণ করে। তাঁর অফুরন্ত দয়ায় জগতের সব কিছু চলছে। তাঁর কাছেই সকলে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাঁর অপার করুণা লাভ করেই বিশ্ব-সংসারের প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদ প্রাণধারণ করে আছে। তাঁর দয়া ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও চলতে পারি না। সুখে-দুখে, শয়নে-স্বপনে তিনি আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা রিক্ত হস্তে পরম ভক্তিভরে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই : হে প্রভু, আমাদের দেহে ও হৃদয়ে শক্তি দাও। আমরা যেন তোমার আরাধনায় নিজেদের নিবেদন করতে পারি।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্রষ্টার মহিমা সম্পর্কে জানবে এবং তাদের মনে ধর্মবোধ জাগবে। তারা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে তৎপর হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সঁপিতে' শব্দের অর্থ কী?
ক. স্মরণ করতে
খ. প্রার্থনা করতে
গ. ভক্তি করতে
ঘ. সমর্পণ করতে

২. ‘সদা আত্মহারা তব গুণগানে’ –কারা আত্মহারা?

ক. মানুষ
খ. পাখি
গ. প্রকৃতি
ঘ. তরুলতা

৩. ‘নিকুঞ্জ বিতান’ শব্দদ্বয়ের অর্থ:

ক. ফুলের দোকান
খ. ফুলের বাগান
গ. বৃক্ষরাজির বাগান
ঘ. চারাগাছ বিক্রির দোকান

৪. কবি স্রষ্টার কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন কোন চরণের মধ্য দিয়ে–

ক. দেহ হৃদে বল
খ. তুমি মোর পথের সম্বল
গ. ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ
ঘ. স্মরিলে তোমারে, নিভে শোকানল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতাংশটুকু পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

এই বিশাল পৃথিবী, তার অপর সৌন্দর্য, প্রাণের সঞ্চার, উপভোগের বিশাল আয়োজন সব কিছুই পরম করুণাময় স্রষ্টার দান। ভক্ত হৃদয় এই দয়ার দান প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করে এবং স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ভক্তের হৃদয়নিঃসৃত বাণী:

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!

ক. বিভো শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

খ. উদ্ধৃতির আলোকে স্রষ্টার প্রতি মানুষের অসীম কৃতজ্ঞতার কারণ কী–বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে স্রষ্টার যে অবদানসমূহের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তোমার পাঠ্য কবিতাটির স্মরণে তার তালিকা তৈরি কর।

ঘ. কবি তার ভক্তহৃদয়ে ‘বল’ দেবার জন্য স্রষ্টার কাছে কীভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন–বিশ্লেষণমূলক উত্তর দাও।

২. উদ্ধৃতাংশটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

স্রষ্টা পরম করুণাময়। ভক্ত কবির স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কিন্তু তিনি প্রার্থনা করার প্রথাগত নিয়ম জানেন না। কেবল চোখের জলে নিজেকে স্রষ্টার কাছে নিবেদন করেছেন। সুখ–শান্তিতে, মঙ্গল–অমঙ্গলে, প্রাপ্তিতে–বিরহে তিনি আকুল হয়ে স্রষ্টাকে স্মরণ করেছেন। কেননা স্রষ্টাই পরম স্নেহশীল, স্রষ্টাই মঙ্গলময়।

ক. উদ্ধৃতিটির মর্মকথা কোন কবিতার বিষয়বস্তু?

খ. স্রষ্টার প্রতি কবি কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন–ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ধৃত অংশটি তোমার পঠিত কবিতার সাথে কতটুকু সঙ্গাতিপূর্ণ?

ঘ. উদ্ধৃতির আলোকে স্রষ্টার মঙ্গালময় স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

দুরন্ত আশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মর্মে যবে মত্ত আশা
 সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
 দাপিয়া বৃথা রোষে
তখনো ভালো-মানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
 খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
 স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে বসে!
ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।

দেখা হলেই মিষ্ট অতি
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্টগতি,
গৃহের প্রতি টান-

তৈল–ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণ–তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুট্‌ছে ঘোড়া, উড়ছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়–তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন–
বর্‌শা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল–বাধা–হীন।

বিপদ–মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে
শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে
জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।

বিশ্বমাঝে মহান যাহা
সঙ্গী পরানের–
ঝঞ্ঝা মাঝে ধায় সে প্রাণ,
সিন্ধু মাঝে লুটে।

নিমেষ–তরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন–উচ্ছ্বাসে–
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
উর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে
আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে। (সংক্ষেপিত)

কবি-পরিচিতি

বিশ্বকবি, বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পড়াশুনায় তাঁর মন বসেনি। পড়াশুনার জন্য তাঁকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠ শেষ করবার আগেই তিনি সেসব ছেড়ে দেন। সতেরো বছর বয়সে তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত পাঠানো হয়। কিন্তু ব্যারিস্টারি পড়া শেষ না করেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর কবি–প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর 'বনফুল' নামে কবিতার বই বের হয়। সাহিত্যের সকল শাখায় অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। কবিতা, সংগীত, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ, উজ্জ্বল। তিনি একাধারে কবি, দার্শনিক, সুরকার, শিক্ষাবিদ, নাট্য–প্রযোজক ও অভিনেতা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য হল : মানসী, সোনার তরী, কল্যাণী, চিত্রা, বলাকা, খেয়া, ক্ষণিকা, সেঁজুতি, পুনশ্চ, নৈবেদ্য, পুরবী, মহুয়া ও শেষ লেখা। আমাদের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' তাঁরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

শব্দার্থ

মর্ম – হৃদয়, মন।
তক্তপোশ – চৌকি।
মত্ত – মাতাল, এখানে প্রবল অর্থে ব্যবহৃত।
ক্লিষ্টগতি – ক্লান্তগতি।
সর্পসম – সাপের মতো।
স্নিগ্ধ তনু – সুন্দর দেহ।
রোষ – রাগ, ক্রোধ।
নিদ্রারসে ভরা – ঘুম–কাতর।
অদৃষ্ট – ভাগ্য, কপাল।
বহরে – আকারে।
অন্নপায়ী – যে অন্ন পান করে, কবি এখানে বোঝাতে চান যে, আমরা কষ্ট করে ভাতও চিবিয়ে খেতে চাইনে।
বহ্নি – আগুন।
নিরুদ্দেশ – অজানার পথে পাড়ি জমানো।
শোণিত – রক্ত।
স্তন্যপায়ী – যে মায়ের দুধ পান করে, শিশু।
সুপ্ত – নিদ্রিত।
জটলা – ভিড়।
গুপ্ত – গোপন।

টীকা

পোষমানা এ প্রাণ– ঘরের প্রতি আমাদের টান বড় বেশি। বাইরের জগতে যে পরিবর্তন আসে তার প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। খাঁচায় পোষ মানানো প্রাণীর মতোই আমরা গৃহকোণে আবন্ধ।

বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ– মরুবাসী বেদুয়িন বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। তপ্ত মরুর বুকে সে ঘোড়া ছুটিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমায়। সামনের বাধা–বিপত্তিকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

পাঠ-পরিচিতি

'দুরন্ত আশা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। ভীরুতা নয়, সাহসিকতার মধ্যে জীবনের প্রকৃত পরিচয় নিহিত– কবি তাঁর কবিতায় এ সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন।

আমরা একটি অতি আরামপ্রিয় জাতি। ভদ্রতার মুখোশ পরে আমরা নিজেদের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখি। আমাদের মনে

যখন কোনো উচ্চাশা জাগে তখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে আমরা নিজেদের গৃহকোণে আবদ্ধ রাখি। সংগ্রামের পথ বেছে নিতে আমরা নারাজ, প্রাণের ভয় আমাদের সবসময় উদ্বিগ্ন করে রাখে। নিতান্ত ভালো মানুষ সেজে নিরীহ জীবনযাপনই আমাদের কাম্য। আমরা একান্তভাবেই ঘরমুখো– সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আমাদের নেই। কবির কাছে এ জীবন আকাঙ্ক্ষিত নয়। আরবের মরুচারী বেদুয়িনদের উদ্দাম স্বাধীন জীবন তাঁকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। বিপদের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যেই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান। এ বিশ্বের যা কিছু মহান ও কল্যাণকর তা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

ভীরুতা নয়, সাহসিকতার মধ্যে জীবনের প্রকৃত অর্থ নিহিত– শিক্ষার্থীরা এ সত্য উপলব্ধি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দুরন্ত আশা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে?

ক. মানসী
খ. সোনার তরী
গ. বলাকা
ঘ. ক্ষণিকা

২. 'দুরন্ত আশা' কবিতার মূল বক্তব্য কোনটি?

i. কাপুরুষতায় জীবনের সার্থকতা নেই
ii. শান্তিপ্রিয় মানুষই সার্থক মানুষ
iii. সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সার্থকতা আসে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. i ও iii

৩. 'মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান'—পঙ্ক্তিটির অর্থ কী?

ক. বাঙালি লম্বায় খাটো দেহে চওড়া
খ. বাঙালি বুদ্ধিতে খাটো দেহে চওড়া
গ. বাঙালি দেহে ক্ষীণকায় বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ
ঘ. বাঙালি ধৈর্যশীল এবং সংগ্রামী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

আমরা অলস, নির্বিকার ও আরামপ্রিয় জাতি। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের মূলমন্ত্র, গৃহকোণ আমাদের নিরাপদ স্থান। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অন্তরের উচ্চাশাকে আমরা দমিত রাখি। প্রাণের ভয় আমাদের বিশ্বজয়ের পথকে রুদ্ধ করে রাখে।

ক. উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল আছে।

খ. 'আমরা অলস, নির্বিকার আরামপ্রিয় জাতি'–বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্ধৃতিটির সঙ্গে তোমার পঠিত কবিতাটির কোন কোন ক্ষেত্রে মিল আছে–উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

ঘ. প্রাণের ভয় আমাদের বিশ্বজয়ের পথকে রুদ্ধ করে রাখে।'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃতিটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

ভীরুতা নয়, সাহসিকতার মধ্যেই জীবনের অর্থ নিহিত আছে। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের প্রত্যয়। বিপদের মুখোমুখি হয়ে জয়কে ছিনিয়ে আনাই জীবনের সাহসিকতা। আরব বেদুয়িনদের কাছে উদ্দাম স্বাধীন জীবনই কাঙ্ক্ষিত। বিশ্বের সকল মঙ্গলময় অর্জনই সম্ভব হয়েছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

১. বেদুয়িন কারা?

২. সামনের দিকে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়–বুঝিয়ে লেখ।

৩. 'কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সাহসিকতা প্রয়োজন' এই মন্তব্যটি তোমার পঠিত 'দুরন্ত আশা' কবিতার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?–আলোচনা কর।

৪. 'ভীরুতা নয় সাহসিকতাই জীবনের অর্থ'–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

অভিযান

কাজী নজরুল ইসলাম

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান!
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ-
"মানুষ মহীয়ান!"
চারদিকে আজ ভীরুর মেলা,
খেল্‌বি কে আর নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কি উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান্‌॥

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আস্‌বে রণ-সজ্জা কবে,
সেই আশায়ই রইলি সবে!
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান॥

আঁধার ঘোরে আত্মঘাতী
যাত্রা-পথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।
অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চল্‌!
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
উষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
'জয় নব উত্থান!'



কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে (বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নজরুল ইসলাম বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি স্কুল ছেড়ে বাঙালি পল্টনে যোগাদান করেন। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হলে চারদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কবিতায় পরাধীনতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উচ্চারিত হয়েছে। অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখায় প্রবল প্রতিবাদ করেন। এজন্য তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়।

কবিতা, সংগীত, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প–সাহিত্যের সকল শাখায় আমরা তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় পেয়ে থাকি। বাংলায় তিনি ইসলামি গান ও গজল লিখে প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁর লেখায় তিনি আরবি–ফারসি শব্দের ব্যবহারে কুশলতা দেখিয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে, মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর সাহিত্যসাধনায় ছেদ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কবিকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে, 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'সিন্ধু–হিন্দোল', 'চক্রবাক', 'রিক্তের বেদন' ইত্যাদি। কবি ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

অভিযান – নতুন কিছু জয়ের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়া

উজান – স্রোতের বিপরীত দিক।

উচ্চার – উচ্চারণ করো, ঘোষণা কর।

পরশ – স্পর্শ, ছোঁয়া।

মহীয়ান – যে মহিমা বা মহত্ত্ব লাভ করে।

নাঙ্গা – নগ্ন, খালি।

ভীরু – যে ভয় পায়; বিপদে বা বাধার সামনে যে সাহসের পরিচয় দিতে পারে না।

আদুল – অনাবৃত, খোলা।

সমর – যুদ্ধ।

রণসজ্জা – যুদ্ধের সাজ।

মাদল – এক রকমের বাদ্যযন্ত্র।

উত্থান – জাগরণ।

টীকা

মানুষ মহীয়ান– মানুষই কেবল মহত্ত্ব লাভ করতে পারে। মানুষ তার সৃষ্টি–শক্তিবলে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে। সকল প্রকার বাধা তুচ্ছ করে যখন সে সম্মুখ পথে এগিয়ে চলে তখনই নতুন প্রভাতের সূচনা ঘটে।

স্বর্গে দিবি টান– এখানে স্বর্গ বলতে মহাকাশকে বোঝানো হয়েছে। নতুন দিনের অভিযাত্রী দল একদিকে যেমন ভূগর্ভের সম্পদ আহরণ করবে অন্যদিকে তেমনি বিশাল মহাকাশের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে।

পাঠ-পরিচিতি

'অভিযান' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু–হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।

নতুন দিনের তরুণ অভিযাত্রী সামনে এগিয়ে চলবে। সামনের বিপদ ও বাধাকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে, মানুষই কেবল নিজের চেষ্টায় মহত্ত্ব লাভ করতে পারে। তরুণ অভিযাত্রী সংগ্রামের পথ বেছে নেবে। নতুন দিনের নতুন প্রভাত তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।

নবজাগরণের জয়গান গীত হবে তরুণ অভিযাত্রীর কণ্ঠে।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীদের মনে নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা জাগবে। বিপদ ও বাধাকে তুচ্ছ করে তারা সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা লাভ করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন গুচ্ছের সবগুলো গ্রন্থই কাজী নজরুল ইসলাম রচিত
   - ক. রিক্তের বেদন, সিন্ধুহিন্দোল, পূরবী, কিশলয়
   - খ. রিক্তের বেদন, কল্যাণী, বেনু ও বীণা
   - গ. বিষের বাঁশী, চক্রবাক, সাম্যবাদী
   - ঘ. অগ্নিবীণা, অশ্রুমালা, সর্বহারা

২. 'সমরসাজ'—এর পরিপূরক শব্দ কোনটি?
   - ক. যুদ্ধযাত্রা
   - খ. রণসজ্জা
   - গ. নৌবহর
   - ঘ. রণভেরী

৩. 'অভিযান' কোন শ্রেণীর কবিতা?
   - ক. প্রশস্তিমূলক
   - খ. বর্ণনামূলক
   - গ. উদ্দীপনামূলক
   - ঘ. গবেষণামূলক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

শান্তি সাহস ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষই পারে নব উত্থানের দিকে এগিয়ে যেতে। চারিদিকের বিরাজমান সংকটকে অতিক্রম করে নতুন প্রভাতের সূচনা করতে পারে মানুষ। তাই ভীরুতা নয় সাহসিকতাই আজ একান্তভাবে কাম্য।

ক. সংকটাপন্ন সময়ে কাকে আহ্বান করা হয়েছে?
খ. মানুষ কীভাবে নতুন প্রভাতের সূচনা করতে পারে,—বর্ণনা কর।
গ. "উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
"মানুষ মহীয়ান!", পঙ্‌ক্তিটির সঙ্গে উদ্ধৃত অংশের বক্তব্যের কী কী মিল আছে বর্ণনা কর।
ঘ. উদ্ধৃত অংশের বক্তব্যকে যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।

২. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

অভিযানের বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্‌ আগে চল্‌
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান।

ক. বীর সেনাদল কারা?
খ. 'জ্বালাও মশাল' উক্তিটির মধ্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন—ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্ধৃত চরণ চারটির মধ্য দিয়ে কীভাবে তোমার পঠিত 'অভিযান' কবিতার মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে—বর্ণনা কর।
ঘ. অভিযানে বীর সেনাদল কীভাবে সার্থকতা অর্জন করতে পারবে—বিশ্লেষণ কর।

খাঁটি সোনা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুর চেয়েও আছে মধুর
–সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।

চন্দনেরি গন্ধভরা,
শীতল করা, ক্লান্তি–হরা
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল পাটি।

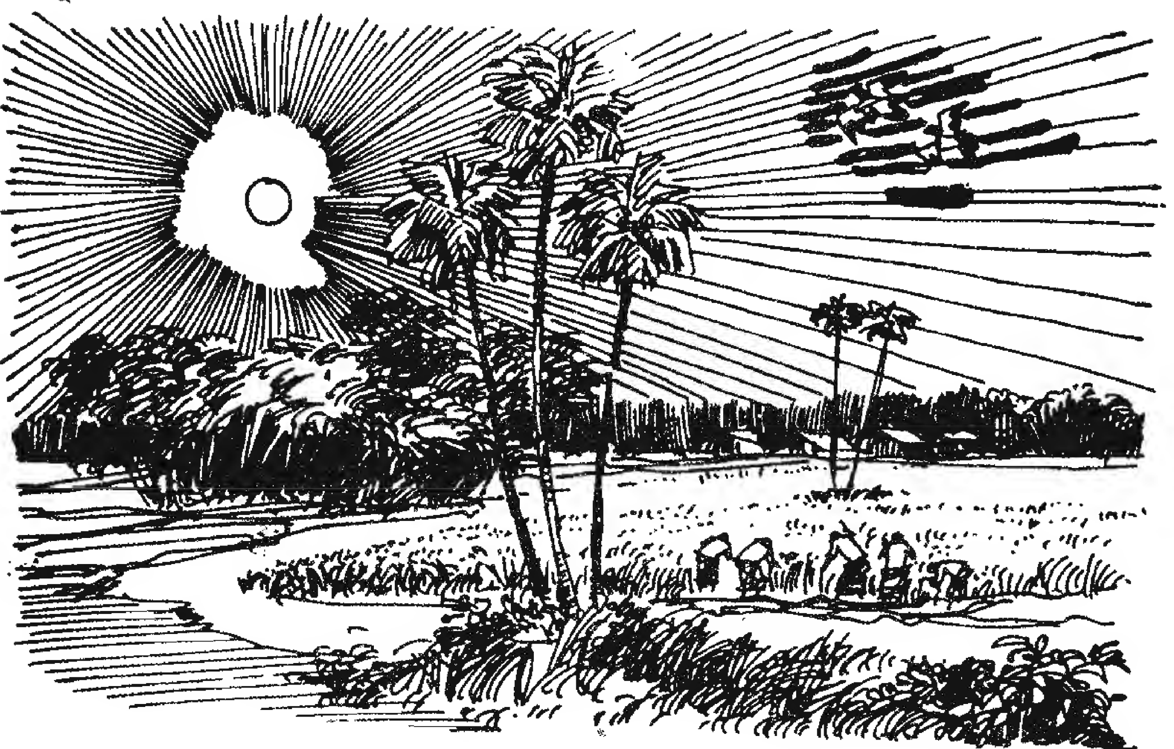
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ–মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।

নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে
সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি।

নারিকেলের গোপন কোষে
অন্ন–পানী' যোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে
আটটি শীষে বাঁধা আঁটি।

মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটি।

(সংক্ষেপিত)



কবি-পরিচিতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভাজন হয়েও তিনি কাব্য–নির্মাণ–কৌশলের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন। তাঁর কবিতার বিষয়গুলো নতুন ছন্দের দিক থেকেও বিচিত্র। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন বলে তিনি 'ছন্দের জাদুকর' বলে খ্যাতি পেয়েছেন। শব্দ ব্যবহারেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এই কবি। বাংলা কবিতায় তিনি প্রচুর আরবি–ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। একজন সফল অনুবাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি পেয়েছেন। তীর্থ সলিল ও তীর্থরেণু– এ দুটি তাঁর অনুবাদ কবিতার সংকলন। বেণু ও বীণা, হোমশিখা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, তুলির লিখন, মণিমঞ্জুষা, অভ্র আবীর, বিদায় আরতি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কবি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শব্দার্থ

ক্লান্তি–হরা – যা ক্লান্তি হরণ করে।

শিয়র – মাথার দিক।

নিদ–মহল – ঘুমের পুরী। এখানে 'রাত্রি' অর্থে ব্যবহৃত।

নিতি – নিত্য, সবসময়।

নাগ – সাপ।

অন্ন–পানী – অন্ন ও পানীয়। এখানে নারকেলের শাঁস ও পানিকে বোঝানো হয়েছে।

কনক ধান – সোনা রঙের ধান, পাকা ধান।

পাঠ-পরিচিতি

'খাঁটি সোনা' কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় কবি আশ্চর্য মমতায় তাঁর প্রিয় স্বদেশের প্রকৃতির রং ও রূপকে তুলে ধরেছেন।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। এদেশের মাটি আমাদের কাছে 'মধুর চেয়েও মধুর'। এদেশের প্রতিটি ধূলিকণা সোনার চেয়েও খাঁটি। এদেশের মাটি যেন চন্দনের সুবাসে ভরা এবং শীতল পাটির মতোই তা আমাদের ক্লান্তি দূর করে। সূর্যের এমন সোনালি আলো, ফুলের সুবাস–মাখা এমন স্নিগ্ধ বাতাস আর কোথাও নেই। এদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় আর বিস্তীর্ণ সাগর। এদেশের অরণ্য প্রান্তরে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দিনে ও রাতে জেগে থাকে বাঘ ও নাগ। এদেশে জন্মায় নারকেলের মতো ফল, যা একই সঙ্গে অন্ন ও পানীয় দুই–ই যোগায়। এদেশের মাটিতেই চাষিরা পরম যত্নে ফলায় সোনার ধান। আমাদের প্রিয় স্বদেশের তুলনা কোথায়!

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা স্বদেশের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবে এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে ভালোবাসবে। তারা কবিতাটি আবৃত্তি করে আনন্দ পাবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি সত্যেন্দ্রনাথ কোন নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন?

ক. বিশ্বকবি — খ. বিদ্রোহী কবি
গ. ছন্দের কবি — ঘ. পল্লীকবি

২. ‘কনক’ শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?

ক. কণিকা — খ. কাঞ্চন
গ. করবী — ঘ. কাঁকন

৩. ‘সাগর সে তার ধোয়ায় পাটি’ চরণটির অর্থ কী?

ক. বাংলাদেশ নদী বিধৌত — খ. নদী সাগরে পতিত হয়
গ. বাংলাদেশ সাগর দ্বারা সমৃদ্ধ — ঘ. বাংলাদেশের পাদদেশে সমুদ্র

৪. খাঁটি সোনা কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে–

i. প্রকৃতিপ্রীতি
ii. দেশের প্রতি মমতা
iii. স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii — খ. i ও iii
গ. ii ও iii — ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও:

প্রতিটি মানুষের কাছে প্রিয় তার জন্মভূমি। কবিগণ তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে এই দেশপ্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলাদেশের অপরূপ প্রকৃতি–নানাভাবে কবির মনকে আলোড়িত করেছে। এদেশের ধূলিকণা, পাহাড়, অরণ্য, ফুল–ফল ইত্যাদি প্রকৃতির প্রতিটি জিনিস বৈচিত্র্যপূর্ণ। পরম মমতায় স্বদেশের এই রং রূপকে তুলে ধরেছেন যুগ–যুগান্তরের কবিগণ।

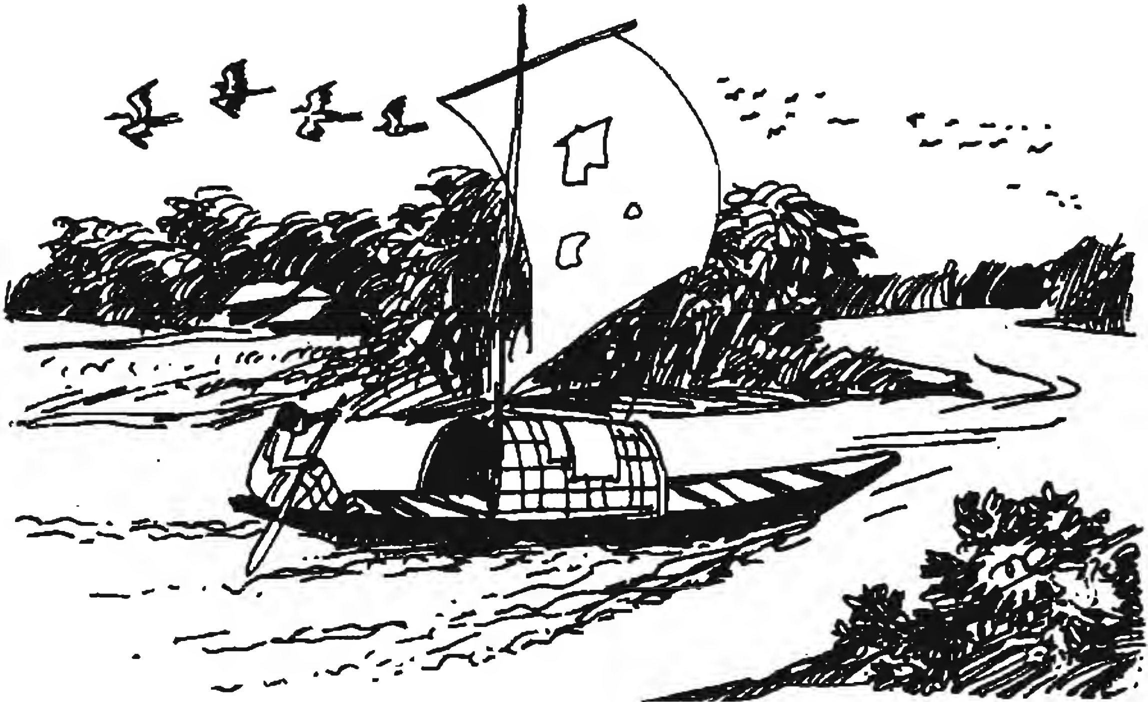
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত জন্মভূমিবিষয়ক কবিতাটির নাম কী?
খ. জন্মভূমির অপরূপ প্রকৃতি কীভাবে কবির মনকে আলোড়িত করেছে–বর্ণনা দাও।
গ. তোমার পঠিত কবিতায় কীভাবে উদ্ধৃত অংশের প্রতিফলন ঘটেছে–বুঝিয়ে লেখ।
ঘ. প্রকৃতি কীভাবে কবিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে আলোচনা কর।

আবার আসিব ফিরে

জীবনানন্দ দাশ

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল–ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।



কবি-পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা সিটি কলেজ, দিল্লি রামযশ কলেজ, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, খড়গপুর কলেজ, বরিষা কলেজ ও হাওড়া কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। এক সময় তিনি সাংবাদিকতা পেশাও অবলম্বন করেছিলেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নিজের দেশের প্রকৃতির রং ও রূপের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। অনেক অজানা গাছ, পশু-পাখি ও লতাপাতা তাঁর কবিতায় নতুন পরিচয়ে ধরা পড়েছে।

তাঁর রচিত গ্রন্থ: কাব্য–ঝরা পালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা। গল্প–জীবনানন্দ দাশের গল্প; উপন্যাস–মাল্যবান; প্রবন্ধ–কবিতার কথা ইত্যাদি।

তিনি ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় নিহত হন।

শব্দার্থ

শঙ্খচিল – এক ধরনের সাদা চিল।
ঘুঙুর – নূপুর, পায়ের অলংকার।
ডাঙা – শুকনো জায়গা, স্থলভূমি।
সুদর্শন – এক ধরনের গুবরে পোকা।
লক্ষ্মীপেঁচা – সুলক্ষণযুক্ত পেঁচা।
ডিঙা – ছোট নৌকা।
নীড়ে – পাখির বাসায়।
ধবল – সাদা।

টীকা

নবান্ন–নতুন ধান কাটার পর আমাদের দেশে এ উৎসব হয়। এ উৎসবে দুধ, গুড়, নারকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন আতপ চালের ভাত খাওয়া হয়।

ধানসিঁড়ি–ঝালকাঠি জেলায় ধানসিঁড়ি নামে একটি নদী ছিল। এখন নদীটি মরে গেছে। কবি তাঁর কবিতায় এ নদীটির নাম ব্যবহার করেছেন।

রূপসা–খুলনা শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি নদীর নাম। এ নামে ঝালকাঠি জেলায়ও একটি ছোট নদী আছে।

জলাঙ্গী–কবি এখানে নদীকে জলাঙ্গী (অর্থাৎ জল যার অঙ্গে) নামে অভিহিত করেছেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে কবি 'জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলা' বলেছেন।

কার্তিকের নবান্নের দেশে–কবি নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশকে 'নবান্নের দেশ' বলেছেন। 'নবান্ন' অর্থ নতুন ভাত। কার্তিক মাসে ঘরে নতুন ধান তুলে কৃষকেরা নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে।

পাঠ-পরিচিতি

এ কবিতাটি কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি এ কবিতায় দেখিয়েছেন যে, তিনি নিজের দেশকে খুবই ভালোবাসেন। প্রিয় জন্মভূমির অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসগুলো তাঁর দৃষ্টিতে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। কবি মনে করতেন, যখন তাঁর মৃত্যু হবে তখন দেশের সঙ্গে তাঁর মমতার বাঁধন শেষ হবে না। তিনি বাংলার নদী, মাঠ, ফসলের খেতকে ভালোবেসে শঙ্খচিল বা শালিকের বেশে এদেশে ফিরে আসবেন। আবার কখনও বা ভোরের কাক হয়ে কুয়াশায় মিশে যাবেন। এমনও হতে পারে, তিনি হাঁস হয়ে সারাদিন কলমির গন্ধে ভরা বিলের পানিতে ভেসে বেড়াবেন। এমনকি দিনের শেষে যে সাদা বকের দল মেঘের কোল ঘেঁষে নীড়ে ফিরে আসে তাদের মাঝেও কবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এভাবে তিনি বাংলাদেশের রূপময় প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাবেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে। তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ধানসিঁড়ি কিসের নাম?

ক. নদীর খ. শহরের
গ. ধানের ঘ. ফলের

২. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. রূপসী বাংলা
গ. বনলতা সেন ঘ. ঝরাপালক

৩. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কী?

ক. দেশপ্রেম খ. প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য
গ. বাংলার গ্রামীণ জীবনের বর্ণনা ঘ. বাংলার জীববৈচিত্র্য

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতির অংশটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়ির তীরে–এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়–হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল–ছায়ায়;

ক. উদ্ধৃত অংশটি কোন কবিতার অংশ?
খ. উল্লেখিত কবিতাংশ বাংলার কোন রূপ ফুটে উঠেছে?
গ. 'আবার আসিব ফিরে' কবিতা পাঠ করে তোমার মনেও কি একই ইচ্ছা জাগ্রত হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
ঘ. কবি কীভাবে আবার বাংলায় ফিরে আসতে পারেন? তোমার পঠিত 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর?

২. পঙ্‌ক্তি কয়টির আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা যায়; রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকার আসিতেছে নীড়ে দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

ক. পঙ্‌ক্তি কয়টি কোন কবিতার অংশ?
খ. পঙ্‌ক্তি কয়টির আলোকে গ্রামীণ প্রকৃতির বর্ণনা দাও।
গ. এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে তোমার দেখা প্রকৃতির তুলনামূলক পরিচয় দাও।
ঘ. 'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে'–এই উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

রাখালছেলে

জসীমউদ্‌দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,–
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙিন ফুল?
কাঁচা–ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি–লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু।
গা–খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদলা ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি–মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে–জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার?
রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ–
কালো–বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।



কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় আমরা পল্লীর মানুষ ও প্রকৃতির সহজ সুন্দর রূপটি দেখতে পাই। পল্লীর মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর কবিহৃদয় যেন এক হয়ে মিশে আছে। এ কারণেই তাঁকে 'পল্লীকবি' বলা হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কিছুকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। পরে তিনি সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'কবর' কবিতাটি বিশেষ প্রশংসিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : *নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, রাখালী, বালুচর, মাটির কান্না, হাসু, এক পয়সার বাঁশী* ইত্যাদি। তাঁর 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'চলে মুসাফির' তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনী।

১৯৭৬ সালের ১৪ই মার্চ কবি ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

শব্দার্থ

ভ্রমর – ভোমরা।

নবীন তৃণ – নতুন ঘাস, কচি ঘাস।

জালি-লাউ – খুব কচি লাউ।

শাঙন মাস – শ্রাবণ মাস।

দ'তের – দোয়াতের।

কেতাব – বই, পুস্তক।

তরু – বৃক্ষ, গাছ-গাছালি।

ধরা – ধরনী, পৃথিবী।

ভুবনময় – পৃথিবী জুড়ে।

বিজলি মেয়ে – এখানে বিদ্যুৎকে বিজলি মেয়ে বলা হয়েছে।

আলোর খেল – আলোর খেলা, বিদ্যুতের ঝিলিক।

টীকা

নবীন তৃণের ছায়া– কচি ঘাসের হালকা সবুজ রং আমাদের আকর্ষণ করে। মনে হয়, সবুজ ঘাস এক মায়াময় ছায়া বিস্তার করে আছে। এ ছায়া আমাদের মনে কোমল অনুভূতির সৃষ্টি করে।

বাদলা ধোয়া মেঘ– যে মেঘে বৃষ্টি হয়ে গেছে। চাষির ছেলে রূপাই–কালো তার গায়ের রং। বৃষ্টি যেন নরম মসৃণ দেহখানা পরম যত্নে ধুয়ে দিয়ে গেছে।

পাঠ-পরিচিতি

'রূপাই' কবিতাটি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত। এ কবিতায় প্রকৃতির পটে চাষির ছেলে রূপাই-এর সহজ সুন্দর রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

চাষির ছেলে রূপাই। কালো তার গায়ের রং, কিন্তু সে কালো আমাদের দৃষ্টিতে মায়ার পরশ বুলিয়ে দেয়। সে যেন পল্লী-প্রকৃতির সহজ সরল রূপকে ধরে রেখেছে তার সর্বাঙ্গে। সে রূপ সহজেই সকলের হৃদয় জয় করে। তাকে দেখে এক সহজ আনন্দে মন ভরে যায়। চাষির ছেলে কালো রূপাইয়ের তুলনা নেই।

পাঠের উদ্দেশ্য

তরুণ চাষির সৌন্দর্য যে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশেরই অঙ্গ, এ অনুভূতি শিক্ষার্থীদের মনে জাগবে, কিশোরমনে কল্পনা ও সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটবে। শহুরে তরুণদের তুলনায় গ্রামের তরুণ যে তুচ্ছ নয়, বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অধিকারী– এই ধারণাটি শিক্ষার্থীদের নতুন চিন্তার সুযোগ দেবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘রূপাই’ কবিতাটি পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন–এর কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে লওয়া হয়েছে?

ক. নকশী কাঁথার মাঠ
খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. বালুচর
ঘ. রাখালী

২. ‘রূপাই’ কবিতায় কিসের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে?

ক. পল্লীপ্রকৃতির
খ. বর্ষাকালের
গ. কালো চোখের
ঘ. মূল চরিত্রের

৩. ‘বিজলি মেয়ে’ বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. বিদ্যুৎকে
খ. কোনো এক মেয়েকে
গ. কবিতার মূল চরিত্রকে
ঘ. রূপাই–এর প্রেমিকাকে

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙিন ফুল?
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তার সাথেকে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।

৩. উদ্ধৃতাংশের পরের পঙ্ক্তি কোনটি–

ক. জালি–লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু।
খ. বাদলা ধোয়া মেখে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল।
গ. কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি।
ঘ. কালো বরণ চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।

৪. নিচের উপাত্তগুচ্ছের কোনটি রূপাই–এর রূপ–বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. কাঁচা ধানের পাতা, লাউয়ের ডগা, কুমড়ার ফালি
খ. কালো ভ্রমর, কাঁচা ধানের পাতা, কদম ফুল
গ. তমাল তরু, বাদল ধোয়া মেঘ, লাউয়ের ডগা
ঘ. বিজলি–মেয়ে, তমাল তরু, কুমড়ার ফালি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রূপাই কবিতায় তরুণ চাষির সৌন্দর্যকে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একীভূত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। রূপাই–এর গায়ের রং কালো, কিন্তু সে কালোতে রয়েছে মায়ার দৃষ্টি। পল্লীপ্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ কচি লাউয়ের ডগা সবুজ, ধানের পাতা, তমাল গাছ তার সর্বাঙ্গে বিরাজমান। সে রূপ সকলকে মুগ্ধ করে। কবির দৃষ্টিতে চাষিদের ঐ কালো ছেলে সব করেছে জয়।

ক. রূপাই কবিতায় কবি কোন ধরনের ছেলের বর্ণনা দিয়েছেন?

খ. উদ্ধৃতাংশের আলোকে রূপাই–এর দৈহিক গঠনের বর্ণনা দাও।

গ. উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত উপমাদি রূপাই–এর রূপ–বর্ণনায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'চাষিদের ঐ কালো ছেলে সব করেছে জয়', তোমার পঠিত কবিতার আলোকে পঙ্ক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

স্মৃতিস্তম্ভ

আলাউদ্দিন আল আজাদ



স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কী বন্ধু, আমরা এখনও
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো! যে ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারে নি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক! ভয় কী বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার।

এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল?

ইটের মিনার ভেঙেছে, ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।

কবি-পরিচিতি

কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৩২ সালে নরসিংদী জেলার রায়নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম লেখা গল্প ও প্রবন্ধ 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন তিনি সবেমাত্র স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি' ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন ও চাকরিকালে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের জন্য ১৯৬৫ সালে ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ছোটগল্প – 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'মৃগনাভি' ও 'অন্ধকার সিঁড়ি'। উপন্যাস–'কর্ণফুলী', 'ক্ষুধা ও আশা'। কাব্যগন্থ– 'মানচিত্র', 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ', 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' ইত্যাদি। তিনি নাটক রচনা করেছেন, গবেষণামূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। শিশু–কিশোরদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'জলহস্তী', 'রসগোল্লা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ৩রা জুলাই, ২০০৯ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

স্মৃতির মিনার– ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের উত্তর–পশ্চিম কোণে। কয়েকটি ইট দিয়ে দ্রুততার মধ্যে এই শহীদ মিনারের ভিত্তি রচিত হয়। কবি এই শহীদ মিনারকে বলেছেন স্মৃতিস্তম্ভ।

চার কোটি পরিবার – 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি যখন রচিত হয় সে সময়ে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ছিল চার কোটি। কবি তাই বলেছেন চার কোটি পরিবার অর্থাৎ দেশের আপামর জনগণ।

ভিত – ভিত্তি, ভিত্তিপ্রস্তর।

রাজন্য – রাজরাজড়া, রাজবংশের লোক। এখানে অত্যাচারী পাকিস্তানি শাসকদের কথা বলা হয়েছে।

চূর্ণ যে পদপ্রান্তে – বাংলার সাহসী তরুণ ছাত্রজনতা ১৯৫২–র ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকদের সমস্ত ভয়ভীতি ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকদের শক্তি অহংকার গুঁড়ো করে দিয়েছিল। রাজার ক্ষমতাধর হীরার মুকুট, শাসনের নীল পরোয়ানা, তলোয়ারের আস্ফালন সেদিন নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে।

যারা বুনি ধান – এদেশের সাধারণ কৃষক।

গুণ টানি– যারা শক্ত পেশির হাতে নৌকার দড়ি টেনে সামনে এগিয়ে যায় স্রোতের বিপরীতে।

হাপর চালায় – কঠোর পরিশ্রমী মানুষ, যারা কঠিন লোহাকে গলাতে আগুনের হাপর চালায়, কামার।

সরল নায়ক – এদেশের আন্দোলনরত সাধারণ মানুষ। তারা সহজ সরল জীবনযাপন করে। অথচ তারাই আন্দোলনের মূল শক্তি বা নায়ক।

অনন্য – অসাধারণ, অদ্বিতীয়, তুলনাবিহীন।

জাগরী – জাগ্রত জনতা, জাগরণকারী মানুষ, সচেতন মানুষ।

ঝরে না অশ্রু – সাহসী বীরের চোখে জল আসে না, ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলনে যাঁরা প্রাণদান করে শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণে এদেশের মানুষ আরও শক্তিধর হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য একতাবদ্ধ হয়েছে। তারা কান্নায় ভেঙে পড়েনি, তাদের চোখ জলে ভরে ওঠেনি।

সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং – শহীদদের রক্তদানে এদেশের মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে এক পতাকা–তলে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

বিরহে যেখানে নেই হাহাকার – যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের হারিয়ে বিচ্ছেদ–বেদনায় কেউ হাহাকার করে ওঠেনি। বরং নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে চার কোটি পরিবার।

মহনীয় – মহৎ, স্মরণীয় কীর্তি।

সেতার হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা – শহীদদের মৃত্যুতে শোকের যে কান্না তা পরিণত হয়েছে জলপ্রপাতের পবিত্র ঝরণাধারার মতো, যেন সেতারের স্নিগ্ধ সুরের মতো। আসলে ১৯৫২–র ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মনে এনে দিয়েছিল নতুন এক শক্তি ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রেরণা। তাই এ আন্দোলন বাঙালিদের এক অসাধারণ কীর্তি। এ কীর্তির পথ ধরেই পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

হিমালয় থেকে সাগর অবধি – হিমালয় পর্বত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত, আসমুদ্র–হিমাচল। অর্থাৎ সমগ্র দেশ জুড়ে, উত্তর থেকে দক্ষিণে।

পদাতিক ঋতু – যে ঋতু সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। বাংলার ছয় ঋতু নানা বৈচিত্র্যে ভরা। কবির কবিতা রচনার এ ঋতু দেয় নানা কল্পনার সম্ভার আর প্রেরণা, যোগায় শক্তি।

বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায় – ভাষা আন্দোলনের শহীদদের নাম চিরজাগরূক থাকবে বাঙালির রক্তিম হৃদয়ে, বেহালার করুণ সুরে চিরকাল মনের ভেতর সুরের অনুরণন জাগাবে তারা।

পলাশের তারায় তারায় দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন – লাল পলাশের মতো স্মৃতিময় শহীদদের নাম মনে থাকবে অম্লান হয়ে।

ফেনিল শিলায় – সমুদ্রের ফেনিল জলে ধোয়া শিলার মতো।

বজ্রশিখরে – কঠিন মুষ্টিবন্ধ হাতের অগ্রভাগে।

শপথের ভাস্কর – সূর্যের তীব্র আলোর মতো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

পাঠ-পরিচিতি

১৯৫২–র ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত হয়েছে এ কবিতা। ’৫২–র ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের নির্মম গুলির আঘাতে সেদিন ঢাকার রাজপথ হয় রক্তরঞ্জিত। শহীদ হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিকসহ আরও কয়েকজন। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উত্তর–পশ্চিম কোণে দ্রুততার সঙ্গে নির্মিত হয় শহীদ মিনার। কয়েকটি ইট এনে আবেগপ্রবণ বাঙালিরা মাতৃভাষার জন্য যাঁরা জীবনদান করেছেন তাঁদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার প্রয়াস নেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা এটা সহ্য করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে বাঙালির আবেগমাখা এ স্মৃতিস্তম্ভকে তারা প্রবল ক্রোধে গুঁড়িয়ে দেয়। কবি তাই বলেন– এ মিনার ভেঙে কোনো লাভ নেই। কারণ, চার কোটি বাঙালির ঘরে ঘরে তাদের হৃদয়ে তৈরি হয়েছে যে মিনার তা ভাঙবার শক্তি কোনো রাজরাজড়ার নেই, কোনো শাসকের নেই। কারণ, শহীদেরা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এদেশের প্রত্যেক বাংলাভাষী মানুষের হৃদয়মিনারে। তাদের নাম গর্জে ওঠে সমুদ্রের কলতানে, সেতার আর বেহালার সুরে, ঋতুচক্রের নানা বৈচিত্র্যে, ফুলের শোভা আর পাখির গানে। তারা অমর। তাই তাদের ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙেছে যারা তারা মুছে দিতে পারেনি ভাষা–শহীদদের চিরস্মরণীয় নাম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতায় কবি কোন শহীদদের স্মৃতি উল্লেখ করেছেন?
- ক. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের
- খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের
- গ. বাষট্টির স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের
- ঘ. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের

২. ‘সরল নায়ক’ কারা?
- ক. ভাষা–শহীদেরা
- খ. মুক্তিযোদ্ধারা
- গ. আন্দোলনরত সাধারণ মানুষেরা
- ঘ. রাজনৈতিক নেতারা

৩. নিচের কবিতা অংশটি পড় এবং ৩ নম্বর থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।

৪. যারা বুনি ধান/গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই–এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে–
- i. চাষি, কামার, মিস্ত্রি, মাঝির কথা
- ii. সাধারণ মানুষের কথা
- iii. পেশাজীবী মানুষের কথা

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

উদ্ধৃতিটির আলোকে ৪ ও ৫ নম্বর উত্তর দাও:
'একটি মিনার গড়েছি আমরা/চার কোটি কারিগর'

৫. 'একটি মিনার' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. স্মৃতিসৌধ
খ. জাতীয় পতাকা
গ. বাংলাদেশ
ঘ. শহীদ মিনার

৬. 'চার কোটি কারিগর' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. দেশের অসংখ্য নির্মাণ–শ্রমিককে
খ. দেশের সকল খেটে–খাওয়া মানুষকে
গ. ভাষা–আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকল বাঙালিকে
ঘ. বাংলাদেশী ও বিহারিসহ সকল বাংলাদেশীকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বিশ্বের সকল মানুষের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ইউনেস্কো প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এদেশের মানুষ অনেক রক্ত দেয়। তারই স্মরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিতে উদ্‌যাপিত হবে বলে ইউনেস্কো সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করে। এতে ভাষার জন্য ভাষা–শহীদদের আত্মদান বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করে।

ভাষা–শহীদদের স্মৃতি চিরঅম্লান থাকবে বলে কবি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কী বন্ধু, আমরা এখনও

চার কোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো!

ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের আত্মদান বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে কেন অক্ষয় হয়ে থাকবে?
খ. ভাষা–শহীদদের স্মৃতি চিরঅম্লান থাকবে বলে কবি যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন–'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের' স্বীকৃতি সে রকম একটি– পাওয়া আলোচনা কর।
গ. 'আমরা এখনও/চার কোটি পরিবার/ খাড়া' রয়েছি তো!–এ অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. নিচের কবিতাংশটি পড় এবং এর আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এ–কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু?

হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং এ কোন মৃত্যু?

কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন, বিরহে যেখানে নেই হাহাকার?

ক. 'কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন'–এখানে কোন মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে?
খ. 'হিমালয় থেকে সাগর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে–ব্যাখ্যা কর।
গ. 'শহীদদের মৃত্যুতে এদেশবাসী কাঁদেনি বরং হয়েছে একতাবদ্ধ'–উদ্ধৃত কবিতা অংশে এ উক্তিটি কতটুকু যথার্থ? আলোচনা কর।
ঘ. 'হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং/সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং– অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।



পাঠান–বাদশা লোদি
পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহি গদি,
দেখিল বাবুর এ–জয় তাঁহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি।
গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, 'জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ।
লয়ে লুণ্ঠিত ধন
দেশে ফিরে যাও, নতুবা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'
খানুয়ার প্রান্তরে
সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন–অতীত, যেন বা দৈব বলে
সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।
দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর–হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।
চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান

করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কুর্তার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে,
দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঁড়ায়ে যুবক দিল্লির পথ–পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।
হেন কালে এক মত্ত হস্তী ছুটিল পথের' পরে
পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।
সকলেই গেল সরি
কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ি।
হাতির পায়ের চাপে
'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।
'কুড়াইয়া আন ওরে'
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করি–শুন্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।
চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।
বলিয়া উঠিল এক জন 'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে–আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?
খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,
ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান।'
শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে
বক্ষে চাপিয়া চুমা দেয় তার মুখে।

বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,
এ যে বাহশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।
ভাবিতে লাগিল, 'হরিতে ইহারই প্রাণ
পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?'
বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে
কহিল সঁপিয়া গুপ্ত কৃপাণ বাবুরের করপুটে,–
'জাঁহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ
করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ
সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।
বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়,
ভারত–ভূমির যোগ্য পালক যেবা,
তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,

সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'
রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে
কহিল বাবুর ধীরে,
'বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;
জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে
আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও;
প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।'

কবি-পরিচিতি

কালিদাস রায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কড়াই গ্রামে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে তিনি আদর্শ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিচিত্র বিষয়ের ওপর কবিতা লিখেছেন। তিনি বেশ কিছুসংখ্যক কাহিনী-কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কবি হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে। কালিদাস রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম : কিশলয়, পর্ণপুট, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, বৈকালী, পূর্ণাহুতি ইত্যাদি। তিনি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

হত – নিহত।
শাহি গদি – বাদশাহ্গণ যে আসনে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করেন; সিংহাসন।
জিনিতে – জয় করতে।
রণ – যুদ্ধ।
প্রান্তর – বিস্তৃত মাঠ, ময়দান।
স্বপ্ন-অতীত – স্বপ্নের অতীত, যা স্বপ্নেও দেখা যায় না, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়।
করতল – হাতের তালু।
প্রতিরোধ – বাধা।
তুষ্ট – তৃপ্ত, আনন্দিত, খুশি।
মসনদ – সিংহাসন, রাজাসন।
করি-শুণ্ড – হাতির শুঁড়।
বে-আকুফ – নির্বোধ।
পর্যটক – ভ্রমণকারী।
গুপ্ত কৃপাণ – লুকানো তলোয়ার।
বসুধা – পৃথিবী।
ঘাতক – হত্যাকারী।
দণ্ডবিধান – শাস্তি প্রদান।

টীকা

বাবুর– ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট। তাঁর আসল নাম জহিরুদ্দিন মুহম্মদ। তবে তিনি 'বাবুর' বা 'সিংহ' নামেই সমধিক পরিচিতি। তিনি মাত্র ১১ বছর বয়সে মধ্য-এশিয়ার সমরখন্দের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অল্প বয়সেই দুবার সিংহাসন হারান। তারপর তিনি নিজ দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পরে ভারতের ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন। মেবারের রাজা সংগ্রাম সিংহকে তিনি পরাজিত করেন। এভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠান বাদশা লোদি– ভারতের লোদি বংশীয় শেষ পাঠান-সম্রাট সুলতান ইব্রাহিম লোদি।

পানিপথ– দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে তিনটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগ্রাম সিংহ– রাজপুতানার অন্তর্গত মেবার রাজ্যের অধিপতি রাজা সংগ্রাম সিংহ। তিনি খানুয়ার প্রান্তরে বাবুরের কাছে পরাজিত হন।

খানুয়ার প্রান্তর – আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত যুদ্ধক্ষেত্র।

কৃতঘ্ন দৌলত– বাবুরের ভারত আক্রমণকালে দৌলত খাঁ লোদি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন। তিনি নিজের দুশমন ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন। পরে তিনি বাবুরের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

চিতোর – রাজপুতনার মেবার রাজ্যের রাজধানী।

রণবীর চৌহান– রাজপুত জাতির একটি প্রাচীন শাখার নাম চৌহান। যে স্বদেশপ্রেমিক রাজপুত যুবক বাবুরকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাকে বলা হয়েছে 'রণবীর চৌহান'।

পাঠ-পরিচিতি

'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের 'পর্ণপুট' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় মুঘলসম্রাট বাবুরের মহানুভবতা বর্ণিত হয়েছে। এতে তাঁর মহৎ আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবুর। রাজ্য বিজয়ের পর তিনি প্রজাসাধারণের হৃদয়জয়ে মনোযোগী হলেন। রাজপুতগণ তাঁকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজপুত–বীর তরুণ রণবীর চৌহান বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘুরছিল। এমন সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে–থাকা একটি মেথর–শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে বিস্মিত হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে। মহৎপ্রাণ বাবুর তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পাঠ করার মাধ্যমে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হবে। তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতাটি কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
- ক. কিশলয়
- খ. পর্ণপুট
- গ. ঋতুমঙ্গল
- ঘ. বৈকালী

২. 'জয়ী বলিব না এদেহে রহিতে প্রাণ।' কে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল?
- ক. চৌহান
- খ. সংগ্রাম সিং
- গ. দৌলত খাঁ
- ঘ. ইব্রাহিম লোদি

৩. 'বীরভোগ্য এ বসুধা'–একথার অর্থ কী?
- ক. বীরপুরুষেরাই এ পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়ে থাকেন
- খ. বীরপুরুষগণই পৃথিবীতে কীর্তি স্থাপন করে থাকেন
- গ. বীরগণ পৃথিবীকে বেশি ভোগ করেন
- ঘ. এ পৃথিবীতে বীরের অধিকারই স্বীকৃত

৪. 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় ফুটে উঠেছে বাবুরের–
- i. ক্ষমাশীলতা
- ii. বীরত্ব
- iii. মহানুভবতা

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের চরণ দুটো পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।

৫. 'কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর'–কার প্রতিহিংসার ঘোর কেটেছে?
   ক. চৌহানের   খ. সংগ্রাম সিং–এর
   গ. দৌলত খাঁ–এর   ঘ. ইব্রাহিম লোদির

৬. 'করুন এখন দণ্ডবিধান মোর'–কিসের দণ্ডবিধানের কথা এখানে বলা হয়েছে?
   i. প্রতিহিংসার
   ii. অন্ধ মোহের
   iii. অপরাধের

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i   খ. i ও ii
   গ. iii   ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর–হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।

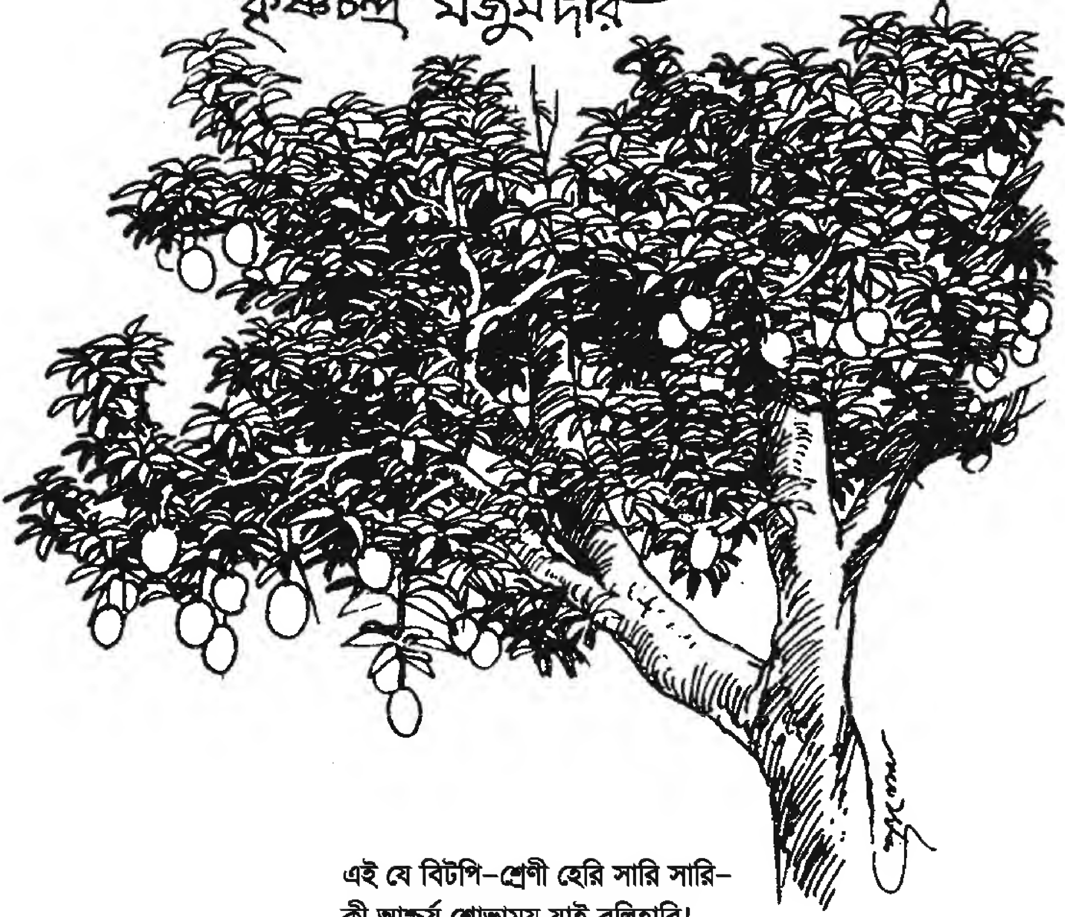
   ক. সম্রাট বাবুর কোন দেশ জয় করেছিলেন?
   খ. মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
   গ. সম্রাট বাবুরের 'সুশাসক গুণাবলি' উপরের কবিতাংশের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. 'ধরিয়া ছদ্মবেশ/ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার 'কোথায় দুঃখ ক্লেশ',–উদ্দীপকের এ অংশটি অবলম্বনে 'বাবুর'– চরিত্র বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কর।

২. কবিতাংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
   'কুড়াইয়া আন ওরে'
   সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
   সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
   'কর কী কর কী' বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
   করি–শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
   পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
   ফিরিয়া আসিল বীর।

   ক. 'কুড়াইয়া আন ওরে'–এখানে কাকে কুড়িয়ে আনার কথা বলা হয়েছে?
   খ. 'কর কী কর কী' বলে জনতা চিৎকার করে ওঠে কেন?
   গ. সম্রাট বাবুর ছিলেন মানসিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও আদর্শবান ব্যক্তিত্ব' উদ্ধৃত কবিতাংশ অবলম্বনে একথাটি ব্যাখ্যা কর।
   ঘ. বাবুরের চরিত্র বিশ্লেষণে 'পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি/ফিরিয়া আসিল বীর',–এ চরণ দুটি মূল্যায়ন কর।

তরু

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার



এই যে বিটপি–শ্রেণী হেরি সারি সারি–
কী আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু–হৃদয় যেমন,
ফল–ভারে নত কেহ গুণীর মতোন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচক্ষে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

কবি-পরিচিতি

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুলনার সেনহাটিতে ১৮৩৪ সালে। সংসারের আর্থিক অনটনে পড়ে তিনি উচ্চ–শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। জীবনের অনেক বাধা–বিপত্তি কাটিয়ে তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ঢাকায় একটি বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত হন এবং শিক্ষকতার চাকরি ত্যাগ করে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'কবিতা কুসুমাবলী', 'মনোরঞ্জিকা', 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকা

সম্পাদনা করেন। পরে আবার তিনি শিক্ষকতার কাজে ফিরে যান এবং যশোর জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যের নাম– 'সদ্ভাব শতক'। কাব্যটি ফারসি কবি হাফেজের ধর্ম ও নীতিভাবজ্ঞাপক কবিতা অবলম্বনে রচিত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম : 'মোহনভোগ', 'কৈবল্যতত্ত্ব'।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ১৯০৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

তরু – গাছ।
বিটপি-শ্রেণী – গাছের সারি।
শোভাময় – সুন্দর ।
বলিহারি – চমৎকার।
সাধু-হৃদয় – ভালো মানুষের মন।
নত – নিচু হওয়া।
গুণী – গুণ আছে যার।
জ্ঞানচক্ষে – জ্ঞান বা বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে।
ধনবান – ধনী।
শির – মাথা।
সমুন্নত – উঁচু।
ফলশালী – ফলবান।
অহংকার – গর্ব, নিজেকে বড় মনে করা।
সদা – সবসময়।
অবনত – নিচু।

পাঠ-পরিচিতি

'তরু' কবিতাটি কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক' কাব্য থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। কবিতাটির মাধ্যমে সমাজে পরোপকারের কথা বলা হয়েছে। গাছ যে মানুষের আদর্শ হতে পারে তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

তরু বা গাছ দাঁড়িয়ে থেকে কেবল যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা নয়, গাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। গাছে ফলের গৌরব থাকলেও তার কোনো অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষ যদি ধনী হয় তাহলে তার মধ্যে অহংকার দেখা দেয়। গাছ ফলশূন্য হলে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ মানুষের মতো গাছ কারও কাছে অবনত হয় না। মানুষের উচিত গাছ থেকে এসব শিক্ষা গ্রহণ করা।

পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এ কবিতা পাঠের মাধ্যমে সমাজে পরোপকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং তারা চারদিকের গাছকে দেখে গাছের মতো উপকারী হতে তৎপর হবে। সেই সাথে নীতিকথার জন্য কবিতাটি মুখস্থ করবে।

ভাষার কাজ

অনেক শব্দের বেশকিছু প্রতিশব্দ থাকে। প্রতিশব্দের সহায়তায় সুন্দরভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।
'তরু' শব্দের প্রতিশব্দ : গাছ, বৃক্ষ, বিটপি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের লেখা কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
   ক. কবিতা কুসুমাবলী
   খ. সদ্ভাব শতক
   গ. মনোরঞ্জিকা
   ঘ. ঢাকা প্রকাশ

২. বৈশিষ্ট্য বিচারে 'তরু' কবিতাটি একটি
   i. প্রকৃতিপ্রেমমূলক কবিতা
   ii. নীতিকবিতা
   iii. শোকগাথা কবিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. ii ও iii

নিচের চরণ কটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

এই যে বিটপি, শ্রেণী হেরি সারি সারি–
কী আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু–হৃদয় যেমন,
ফল–ভারে নত কেহ গুণীর মতোন।

১. কবিতাংশটির কবি?

ক. মধুসূদন দত্ত খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঘ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী

২. উদ্ধৃতাংশে প্রকাশ পেয়েছে–
   i. বৃক্ষের অবদান
   ii. বৃক্ষের সৌন্দর্য
   iii. বৃক্ষের গুরুত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i ও ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৩. 'ফল–ভারে নত কেহ গুণীর মতোন।' কথাটির অর্থ কী?
   i. ফলের ভারে বৃক্ষের নুয়ে পড়া
   ii. ফলকে গুণের সঙ্গে তুলনা
   iii. ফলবান বৃক্ষ গুণবান মানুষের মতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. i ও iii
গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃনজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত,

ক. কবিতায় কাকে সাধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে
খ. কী অর্থে মানুষের চেয়ে বৃক্ষের স্বভাব ভালো? ব্যাখ্যা কর
গ. বৃক্ষের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধর
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানবচরিত্রের তুলনা কর।

নওল কিশোর
সুফিয়া কামাল

নয়া জামানার নওল কিশোর,
গান গেয়ে ওঠো জাগি,
মুমূর্ষু ধরা সুন্দর হোক
নবীন পরশ মাগি।
আলোর কমল নিষ্পাপ প্রাণ
অকলুষ দুটি আঁখি,
স্বর্গ সুষমা ছড়াইয়া দাও,
ওগো ও নবীন সাকি।

মানস স্বপ্নে তোমাদের যত
ধরণীর এই ধূলি
ফুটিয়ে তুলুক নব আলেখ্য,
বুলাও রঙিন তুলি।
তোমাদের হাটে এনে দাও আজ
হাসি–গান আর আলো,
ঘুচাও ঘুচাও নিবিড় কৃষ্ণ
হিংসা–দ্বেষের কালো।

হাসি দিয়ে ফুল বিকশিত কর,
অশ্রুর মধু দিয়া
মধুময় কর দুঃখ–দৈন্য
ব্যথিত মানব হিয়া।
তোমাদের শ্রমে মাটিতে ফলাও
স্বর্ণশস্য ভার,
ক্ষুধায় ক্লিস্ট মানুষ যেন গো
ধরায় রহে না আর।
জ্ঞান–সিন্ধুতে গাহন করিয়া
উন্নত কর জাতি,
সাধনায় লভো দেহে মনে প্রাণে
দিব্য উজল ভাতি।
ললাটে জ্বলুক বিধির আশিস
দৃঢ়তার প্রত্যয়,
নওল কিশোর–কিশোরীরা মোর,
হোক জীবনের জয়।



কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদ গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কুমিল্লায়। সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার মোটেই সুযোগ ছিল না। তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ছোটবেলা থেকেই কবিতাচর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুকাল তিনি কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা, সমাজসেবা ও নারীকল্যাণমূলক নানা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর কবিতা সহজ, ভাষা সুললিত, ছন্দ ব্যঞ্জনাময়। কবি সুফিয়া কামালের উল্লেখযোগ্য **কাব্যগ্রন্থ হল**– সাঁঝের মায়া, মায়া কাজল, মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, মৃত্তিকার ঘ্রাণ, প্রশস্তি ও প্রার্থনা, মোর যাদুদের সমাধি পরে। তাঁর **গল্পগ্রন্থ**– কেয়ার কাঁটা; **স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ**– একাত্তরের ডাইরী; **শিশুদের জন্য বই** : ইতল বিতল ও নওল কিশোরের দরবারে এবং **ভ্রমণকাহিনী** –সোভিয়েতের দিনগুলো।

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর কবি প্রতিভার জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেসব হল : বাংলা একাডেমী পুরস্কার, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, একুশে পদক, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী পুরস্কার, মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ

জামানা – কাল, যুগ, সময়।
নওল – নতুন।
মুমূর্ষু – মারা যাচ্ছে এমন।
নবীন – নতুন।
পরশ – ছোঁয়া, স্পর্শ।
কমল – পদ্মফুল।
অকলুষ – পবিত্র।
সুষমা – সৌন্দর্য, লাবণ্য।
সাকি – পানীয় পরিবেশনকারী।
মানস স্বপ্নে – মনের স্বপ্নে।
আলেখ্য – ছবি, চিত্র।
তুলি – যা দিয়ে ছবি আঁকা হয়।
কৃষ্ণ – কালো।
অশ্রু – চোখের পানি।
হিয়া – মন, হৃদয়।
শ্রমে – পরিশ্রমে, চেষ্টায়।
ক্লিষ্ট – কষ্ট পেয়েছে এমন, ক্লান্ত।
ধরায় – পৃথিবীতে।
জ্ঞান–সিন্ধু – জ্ঞানরূপ সিন্ধু, জ্ঞানের সাগর।
গাহন – স্নান, গোসল।
লভো – লাভ করো।
ভাতি – আলো।
আশিস – দোয়া, আশীর্বাদ।
প্রত্যয় – বিশ্বাস।

টীকা

নব আলেখ্য– কিশোর–কিশোরীদের ওপরই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। তারাই একদিন দেশকে গড়ে তুলবে, বিশ্বসভায় যোগ্য আসনে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে। ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন তাদের নব নব উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

হিংসা–দ্বেষের কালো– কিশোর–কিশোরীদের জীবন সহজ সরল। তারা দুঃখী মানুষের দুঃখ–কষ্ট দূর করবে। মানুষে মানুষে প্রীতির মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলবে। হিংসা–বিদ্বেষ মানুষের জীবনকে দুঃখময় করে তোলে। নবীন কিশোর–কিশোরীদের এ হিংসা ও হানাহানি দূর করে মানুষের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী নির্মাণ করবে।

জ্ঞান–সিন্ধু– জ্ঞানরূপ সিন্ধু। কবি এখানে জ্ঞানের বিশাল জগৎকে সমুদ্ররূপে গণ্য করেছেন। তরুণ কিশোর নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা লাভ করবে। এ জ্ঞানই তাদের শক্তির উৎস রচনা করবে।

পাঠ-পরিচিতি

'নওল কিশোর' কবিতাটি কবি সুফিয়া কামালের 'নওল কিশোরের দরবারে' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য নবীনদের কাজ করতে হবে। দেশের কল্যাণে নতুন সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ হতে হবে তরুণ–তরুণীদের।

নতুন যুগের কিশোর–কিশোরী নতুন স্বপ্নে জাগরিত হবে। তারা পুরানো পৃথিবীকে নতুন রূপে গড়ে তুলবে। ধূলিমলিন এ পৃথিবীতে তারা স্বর্গের সুষমা আনবে, এখানে তারা সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলবে। হাসি গানে মুখর করবে জীবন। সেখানে কোনো দুঃখ–দৈন্য, হিংসা–বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের শ্রমে এদেশের মাটিতে সোনার ফসল ফলবে, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে তারা অন্ন যোগাবে। তারা জ্ঞানের সাধনায় ব্রতী হবে এবং তাদের কণ্ঠে জীবনের জয়গান গীত হবে।

কবি এই নবীন কিশোর–কিশোরীদের জীবনের বিজয় কামনা করেছেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়লে শিক্ষার্থীদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবে। একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন তার মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। দেশের কল্যাণে তারা নতুন সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'নওল কিশোর' কথাটির অর্থ কী?

ক. দুরন্ত খ. নতুন
গ. উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঘ. ইয়াতিম

২. নিচের কোনটি সুফিয়া কামালের শিশুতোষ গ্রন্থ?

ক. সাঁঝের মায়া খ. মৃত্তিকার ঘ্রাণ
গ. মন ও জীবন ঘ. ইতল বিতল

উদ্ধৃতিটি পড়ে নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও:

তোমাদের শ্রমে মাটিতে ফলাও
স্বর্ণশস্য ভার,
ক্ষুধায় ক্লিষ্ট মানুষ যেন গো
ধরায় রহে না আর।

১. কবিতাংশটি একটি–

ক. উদ্দীপনামূলক কবিতার অংশ খ. প্রশংসামূলক কবিতার অংশ
গ. দেশাত্ববোধক কবিতার অংশ ঘ. নীতিবোধমূলক কবিতার অংশ

২. কবিতাংশটিতে ব্যবহার হয়েছে:

ক. আশাবাদ খ. নির্দেশ
গ. অনুপ্রেরণা ঘ. আশীর্বাদ

৩. ‘তোমাদের শ্রমে মাটিতে ফলাও/স্বর্ণশস্যভার’ কথাটির অন্তর্হিত অর্থ হল–

i. খেতে–খামারে উৎপাদন বাড়াতে হবে
ii. সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হবে
iii. আবিষ্কার উদ্ভাবনে সমৃদ্ধি আনতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জ্ঞান–সিন্ধুতে গাহন করিয়া

উন্নত কর জাতি,

সাধনায় লভো দেহে মনে প্রাণে

দিব্য উজল ভাতি।

ক. ‘নওল কিশোর’ কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ. ‘উন্নত কর জাতি’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
গ. কবিতাংশে কবি যে পরামর্শ দিয়েছেন তোমরা কিশোর–কিশোরী হিসেবে কীভাবে তার প্রতি সম্মান দেখাবে?
ঘ. কবিতার অংশটুকু অবলম্বনে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে জাতির উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

অবাক সূর্যোদয়

হাসান হাফিজুর রহমান

কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তভীষণ মুখমণ্ডলে চমকায় বরাভয়।
বুকের অধীর ফিনকির ক্ষুরধার
শহীদের খুন লেগে
কিশোর তোমার দুই হাতে দুই
সূর্য উঠেছে জেগে।
মানুষের হাতে অবাক সূর্যোদয়,
যায় পুড়ে যায় মর্ত্যের অমানিশা
শঙ্কার সংশয়।

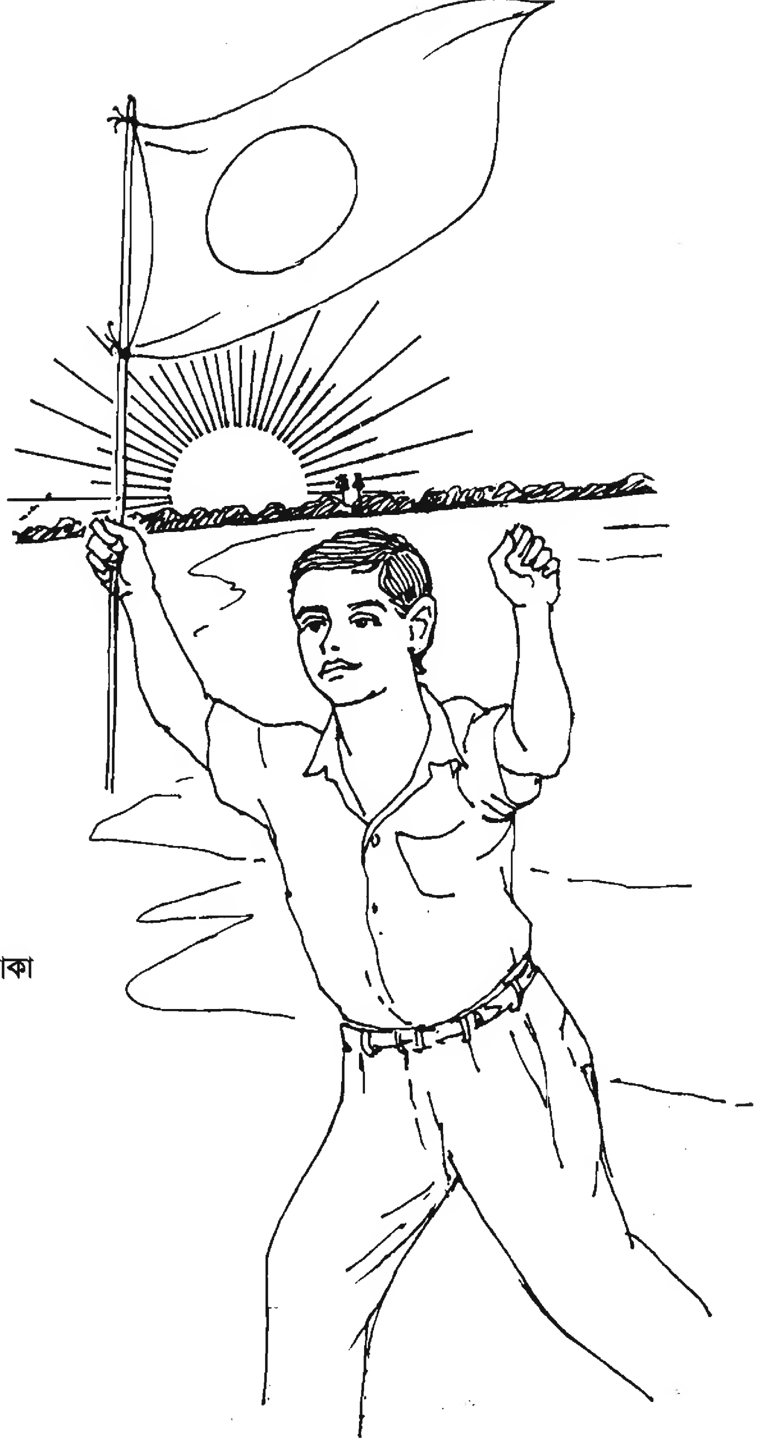
কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখ
প্রবল অহংকারে সূর্যের সাথে
অভিন্ন দেখ অমিত অযুত লাখ।

সারা শহরের মুখ
তোমার হাতের দিকে
ভয়হারা কোটি অপলক চোখ একাকার হল
সূর্যের অনিমিখে।

কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখ
লোলিত পাপের আমূল রসনা ক্রূর অগ্নিতে ঢাকা
রক্তের খরতানে
জাগাও পাবক প্রাণ
কণ্ঠে ফোটাও নিষ্ঠুরতম গান
যাক পুড়ে যাক আপামর পশু
মনুষ্যত্বের ধিক অপমান।

কিশোর তোমার হাত দুটো উঁচু রাখ
কুহেলি পোড়ানো মিছিলের হুতাশনে
লাখ অযুতকে ডাক।

কিশোর তোমার দুই
হাতের তালুতে আকুল সূর্যোদয়
রক্তশোধিত মুখমণ্ডলে চমকাক বরাভয়।



কবি-পরিচিতি

কবি, গল্পকার ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ই জুন জামালপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে ১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনের স্মারক সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পাস করার পর তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকায় ও পরবর্তী সময়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি তৎকালীন 'দৈনিক পাকিস্তান' ও স্বাধীনতা–উত্তরকালে 'দৈনিক বাংলা'য় কাজ করেন। তিনি 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের প্রেস কাউন্সিলর হিসেবে মস্কোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করেন। তিনি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' নামে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে : 'বিমুখ প্রান্তর', 'আর্ত শব্দাবলী', 'অন্তিম শরের মতো', 'বজ্রচেরা আঁধার আমার', 'শোকার্ত তরবারী' এবং গল্পগ্রন্থ 'আরও দুটি মৃত্যু'।

শব্দার্থ

আকুল – কাতর, ব্যগ্র।

রক্তভীষণ মুখমণ্ডলে – রক্তলাল মুখে।

বরাভয় – ভয় না পাওয়ার জন্য আশীর্বাদসূচক বাণী, অভয় বাণী।

খুন – রক্ত।

অবাক সূর্যোদয় – এখানে সূর্য স্বাধীনতার প্রতীক। স্বাধীনতার এই আকাঙ্ক্ষিত উদয় যেন অবাক সূর্যোদয়।

মর্ত্য – পৃথিবী।

অমানিশা – কালো অন্ধকার রাত, অমাবশ্যা। এখানে পরাধীনতার গ্লানির কালো রাতকে বোঝানো হয়েছে।

শঙ্কার সংশয় – ভয় ও সন্দেহ।

প্রবল অহংকারে – গর্বের সঙ্গে, গৌরবের সঙ্গে।

অমিত – অসীম, অপরিমেয়।

অপলক চোখ – যে চোখের দৃষ্টি একদিকে স্থির।

সূর্যের অনিমিখে – সূর্যের দিকে, স্বাধীনতার দিকে।

লোলিত পাপের আমূল রসনা – পাপের লকলকে অস্থির জিহ্বা।

ক্রূর অগ্নিতে ঢাকা – নিষ্ঠুর আগুনে ঢাকা।

আপামর – সর্বসাধারণ, সামান্য লোক পর্যন্ত।

মনুষ্যত্বের – মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক গুণাবলি।

ধিক – অপমান, ধিক্কার।

কুহেলি – কুয়াশা।

হুতাশনে – আগুনে, প্রখর আন্দোলনের উত্তাপে।

রক্তশোধিত – রক্তের স্রোতে পরিশুদ্ধ। মানুষের আত্মদানে পবিত্র।

পাঠ-পরিচিতি

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হয়। এ যেন রক্তিম সূর্যের মতো। নতুন এ দেশকে কবি কল্পনা করেছেন কিশোররূপে। নতুন রক্তিম স্বাধীনতা সূর্যের উদয়ের পর দূর হয়েছে সমস্ত ভয় আর সন্দেহ। স্বাধীনতার এই সোনালি সূর্যকে অম্লান রাখার জন্য সারাদেশের লক্ষ কোটি মানুষ নির্ভয়ে প্রদীপ্ত হাতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যে অহংকার, যে গৌরবে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা তা কোনোদিন ম্লান হওয়ার নয়। কারণ এক অন্ধকার রাতের নিগড় ভেঙে আমরা এ স্বাধীনতা এনেছি। তাই ঐক্যবন্ধ সব মানুষ দৃপ্ত শপথে অঙ্গীকারবন্ধ আজ। এদেশকে এখন জাগিয়ে রাখতে হবে, বুকের ভেতরে অদম্য আশাকে লালন করতে হবে। কবি মনুষ্যত্বের অপমানকারীদের ধ্বংস কামনা করেছেন। তিনি এ বিশ্বাসে স্থির হয়েছেন যে, লক্ষ প্রাণের রক্তস্নাত স্বাধীনতা অর্জনকারী এদেশের মানুষ সমস্ত ভয়কে অতিক্রম করে স্বাধীনতার চেতনাকে অম্লান রাখবে।

আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এ কবিতায় সুন্দরভাবে মূর্ত হয়েছে।

উৎস

কবি হাসান হাফিজুর রহমানের ‘বজ্রচেরা আঁধার আমার’ কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘অবাক সূর্যোদয়’ কবিতাটি নেওয়া হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধ জাগ্রত হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা তারা জানবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘অবাক সূর্যোদয়’, কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
   - ক. বিমুখ প্রান্তর
   - খ. আর্ত শব্দাবলী
   - গ. শোকার্ত তরবারী
   - ঘ. বজ্রচেরা আঁধার আমার

২. কার খুন লেগে সূর্য জেগে উঠেছে?
   - ক. শহীদের
   - খ. পাকবাহিনীর
   - গ. কিশোরের
   - ঘ. রাজাকার বাহিনীর

৩. ‘অবাক সূর্যোদয়’ কবিতা পড়ে তোমার কোন চেতনা জাগ্রত হয়েছে?
   - ক. সাহসের
   - খ. অপমানবোধের
   - গ. মুক্তিযুদ্ধের
   - ঘ. শান্তির

৪. ‘কুহেলি পোড়ানো মিছিলের হুতাশনে। লাখ অযুতকে ডাক।’
   কবিতাংশে ‘লাখ অযুতকে’ বলতে বোঝানো হয়েছে–
   - ক. সেনাবাহিনীকে
   - খ. মেহনতি মানুষকে
   - গ. মুক্তিকামী জনতাকে
   - ঘ. মিছিলের সহযোদ্ধাকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবিতার অংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মানুষের হাতে অবাক সূর্যোদয়,
যায় পুড়ে যায় মর্ত্যের অমানিশা
শঙ্কার সংশয়।

১. ক. কবিতাংশে মানুষের হাতে বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
   খ. সূর্যোদয় বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
   গ. স্বাধীনতার এই উপলব্ধি কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? তোমার অভিমত দাও।
   ঘ. কবিতাংশটুকু বিশ্লেষণ কর।

২. কবিতাংশটুকু পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কিশোর তোমার হাতে দুটো উঁচু রাখ
লোলিত পাপের আমূল রসনা ক্রূর অগ্নিতে ঢাকা
রক্তের খরতানে
জাগাও পাবক প্রাণ
কণ্ঠে ফোটাও নিষ্ঠুরতম গান
যাক পুড়ে যাক আপামর পশু
মনুষ্যত্বের ধিক অপমান।

ক. কবিতাংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?
খ. 'পাবক প্রাণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?—ব্যাখ্যা কর।
গ. স্বাধীনতাযুদ্ধে কবিতার এই পটভূমির বাস্তবতা আলোচনা কর।
ঘ. 'মনুষ্যত্বের ধিক অপমান'—কথাটি কোন প্রসঙ্গে কেন বলা হয়েছে? বিচার বিশ্লেষণ কর।

পণ্ডশ্রম

শামসুর রাহমান

এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ! কান নিয়েছে চিলে,
চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।
কানের খোঁজে ছুটছি মাঠে, কাটছি সাঁতার বিলে,
আকাশ থেকে চিলটাকে আজ ফেলব পেড়ে ঢিলে।

দিন-দুপুরে জ্যান্ত আহা, কানটা গেল উড়ে,
কান না পেলে চার দেয়ালে মরব মাথা খুঁড়ে।
কান গেলে আর মুখের পাড়ায় থাকল কী-হে বল?
কানের শোকে আজকে সবাই মিটিং করি চল।

যাচ্ছে, গেল সবই গেল, জাত মেরেছে চিলে,
পাজি চিলের ভূত ছাড়াব লাথি-জুতো-কিলে।
সুধী সমাজ! শুনুন বলি, এই রেখেছি বাজি,
যে-জন সাধের কান নিয়েছে জান নেব তার আজই।

মিটিং হল ফিটিং হল, কান মেলে না তবু,
ডানে-বাঁয়ে ছুটে বেড়াই মেলান যদি প্রভু।
ছুটতে দেখে ছোট্ট ছেলে বলল, কেন মিছে
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে সোনার চিলের পিছে?

নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।
ঠিক বলেছে, চিল তবে কি নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি, পণ্ড হল শ্রম।

কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর ঢাকা মহানগরীর মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে বি. এ. পাশ করেন এবং পরে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন।

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান কবি। তিনি পঞ্চাশেরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন, জাতীয় আন্দোলন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিজ বাসভূমে, বন্দী শিবির থেকে, এক ধরনের অহংকার, অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই, দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে, হরিণের হাড় ইত্যাদি।

তিনি শিশুদের জন্য এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, স্মৃতির শহর, গোলাপ ফোটে খুকির হাতে ইত্যাদি বই লিখেছেন। তিনি ইংরেজি থেকে কিছু অনুবাদও করেছেন।

কবি শামসুর রাহমান সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য অনেক পুরস্কার লাভ করেছেন। সেগুলো হল : আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার, একুশে পদক, আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, ভাসানী পুরস্কার এবং সাংবাদিকতায় মিৎসুবিশি (জাপান) পুরস্কার ও ভারতের আনন্দ পুরস্কার ইত্যাদি। কবি ১৭ই আগস্ট ২০০৬ তারিখে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শব্দার্থ ও টীকা

পণ্ডশ্রম – বিফল পরিশ্রম, বৃথা শ্রম।
জ্যান্ত – জীবিত, জীবন্ত।
মুখের পাড়া – চোখ, কান ও নাকসহ মুখমণ্ডল ও আশপাশের জায়গাকে বোঝানো হয়েছে।
শোকে – দুঃখে।
মিটিং (Meeting) – সভা।
জাত মারা – জাতিচ্যুত করা (এখানে কলঙ্ক লেপন করা–এই অর্থে ব্যবহৃত)।
সুধী সমাজ – বিদ্বান লোকদের সমাজ।
বাজি – পণ।
সাধের – ইচ্ছার।
জান নেব – মেরে ফেলব।
ফিটিং – মিটিং–এর অনুকার শব্দ। যেমন : কলম–টলম।
পণ্ড হল শ্রম – যে শ্রম বা চেষ্টা বৃথা গেল, যে চেষ্টার কোনো ফল পাওয়া গেল না।

পাঠ-পরিচিতি

মানুষ অনেক সময় নিজের চোখে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কাজে অগ্রসর হয় না। অনেকে অন্যের কথায় কান দেয় এবং অকারণে উদ্বিগ্ন হয়। এভাবে চোখ থাকলেও মানুষ দেখতে চায় না, মাথা থাকলেও মাথা খাটাতে চায় না। ফলে, অন্ধভাবে পরের অনুকরণ ও অনুসরণ করে জীবন বিড়ম্বিত করে। মানুষ যদি নিজের দৃষ্টি ও বিচারশক্তিকে কাজে লাগায় তবে অনেক দুঃখ ও লজ্জাকর অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। কবিতাটিতে বলা হয়েছে যে, চিলে কান নিয়েছে শুনেই যদি চিলের পেছনে দৌড়ানো শুরু হয় তাহলে তা হবে পণ্ডশ্রম আর চরম বোকামি। চিলে কান নিয়েছে শুনে চিলকে ধরার জন্য অনেক কিছু করা হল। অথচ পরে দেখা গেল কান কানের জায়গাতেই রয়ে গেছে। বোকামির জন্য মানুষের চেষ্টা বা শ্রম ব্যর্থ হয়। তাই অকারণে বা অন্যের কথা শুনে কোনো কাজে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়লে শিক্ষার্থীদের মনে বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হবে। অকারণে বা অন্যের কথা শুনে সে কোনো কাজে অগ্রসর হবে না। সে নিজের শ্রমকে উপযুক্ত কাজে ব্যয় করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি শামসুর রাহমানের কবিতার বই কোনটি?

ক. নিজ বাসভূমে
খ. সৌরভের কাছে পরাজিত
গ. উদাত্ত পৃথিবী
ঘ. মৃত্তিকার ঘ্রাণ

২. অন্যের কথা শুনেই কাজে অগ্রসর হলে—

ক. কাজের উদ্যোগ থাকে
খ. কাজের ফল পাওয়া যায়
গ. ভুল পথে যেতে হয়
ঘ. শ্রম সার্থক হতে পারে

৩. কবিতাটি পড়ে কোন বিষয়টি শেখা হল:

ক. ছোট কাজে বড় উদ্যোগ নেওয়া
খ. কাজের সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া
গ. কাজ বোঝার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া
ঘ. বিচার বুদ্ধির সঙ্গে কাজে এগিয়ে নেওয়া।

৪. কান চিলে নিয়েছে, তাতে কী হয়েছে?

ক. সত্তা হারিয়েছে
খ. কলঙ্ক লেপন হয়েছে
গ. উদ্বিগ্ন হয়েছে
ঘ. বোকামির শিকার হয়েছে

সৃনজনশীল প্রশ্ন

১. কবিতাংশটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।
ঠিক বলেছে, চিল তবে কি নয়কো কানের যম?
বৃথাই মাথার ঘাম ফেলেছি, পণ্ড হল শ্রম।

ক. কানের অবস্থান কোথায়, তা কে বলে দিল?
খ. কানের খোঁজের যে অভিযান চালানো হয়েছে তা বিফলে গেল কেন?—আলোচনা কর।
গ. পণ্ডশ্রম, কবিতাটি পড়ে তুমি কী শিখতে পারলে, লেখ।
ঘ. 'চিল তবে কি নয়কো কানের যম?' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

২. চিলে কান নিয়েছে শুনেই যদি চিলের পেছনে সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করা হয়, তবে তা হবে নির্বোধ সিদ্ধান্ত। কান নিয়েছে চিলে, সেজন্যে অনেক লোক মিটিং মিছিল করে তীব্র জ্বালাময়ী বক্তব্য উপস্থাপন করল। শেষ পর্যন্ত এত উদ্যোগের ফল বৃথা গেল। কারণ কান হারায়নি।

ক. কানের খোঁজে সবাই, কোথায় সাঁতার কাটছে?
খ. আমাদের আচরণের কোন বিশেষ দিকটি কবিতায় ফুটে উঠেছে? উল্লিখিত অনুচ্ছেদের আলোকে লেখ।
গ. চিলের পেছনে এত শ্রম দেওয়া কেন হাস্যকর? উপস্থাপন কর।
ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে পণ্ডশ্রম নামটি কতটুকু সার্থক হয়েছে তা বুঝিয়ে লেখ।

একুশের কবিতা

আল মাহমুদ

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়
বরকতেরই রক্ত!

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!

প্রভাতফেরির মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা,
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।



চিনতে নাকি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিল যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলির মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি
ফেব্রুয়ারির শোকের বসন
পরল তারই ভগ্নী।
প্রভাতফেরি প্রভাতফেরি
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদের আসল নাম মীর আবদুস শাকুর আল মাহমুদ। তবে তিনি আল মাহমুদ নামেই পরিচিত। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামের মোল্লাবাড়িতে তাঁর জন্ম। তিনি সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর পরিচালকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই : লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালী কাবিন, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না, বখতিয়ারের ঘোড়া, মিথ্যেবাদী রাখাল, একচক্ষু হরিণ, প্রহরান্তের পাশ ফেরা, পাখির কাছে ফুলের কাছে, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, আমি দূরগামী ইত্যাদি।

তাঁর গল্পের বইয়ের নাম : 'পানকৌড়ির রক্ত', 'সৌরভের কাছে পরাজিত'।

সাহিত্যসাধনায় বিশেষ অবদানের জন্য আল মাহমুদ বাংলা একাডেমী পুরস্কার, জয় বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার, জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার, সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ লেখক সংঘ ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন।

শব্দার্থ

অক্ত – (আরবি ওয়াক্ত) সময়।

লোহিত – লাল রং, রক্তবর্ণ।

প্রভাতফেরি – প্রভাতে গান গেয়ে যে শোভাযাত্রা বা মিছিল করা হয়। এখানে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি বোঝানো হয়েছে।

বিষাদগীতি – শোকগীতি, দুঃখের গান।

রুদ্ধশ্বাসে – শ্বাস বন্ধ অবস্থায়। এখানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে।

বচন – মুখের ভাষা, বুলি।

টীকা

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ–১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের দাবিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক প্রমুখ শহীদ হন। এর পর থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। আর এ আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

বরকত–১৯২৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম আবুল বরকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. শেষ পর্বের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনুষ্ঠিত মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। আবুল বরকত পুলিশের গুলিতে সেদিন নিহত হন। ঢাকা আজিমপুর গোরস্তানে তাঁর কবর রয়েছে।

তিতুমীর–তিতুমীর নামে পরিচিত সৈয়দ নিসার আলী পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। এ উদ্দেশ্যে তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৩১ সালে ইংরেজদের কামানের গোলার মুখে কেল্লাটি ধ্বংস হয়। তিতুমীর এ যুদ্ধে শহীদ হন।

ক্ষুদিরাম–ব্রিটিশের কবল থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য বিপ্লবী অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বাংলার গভর্নর ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর ফুলারকে হত্যা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ সরকার এঁদের ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

পাহাড়তলি–চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ ছিল বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ। সূর্য সেনের নির্দেশক্রমে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে এই ক্লাবে বিপ্লবীরা হানা দেয়। আক্রমণকালে আহত প্রীতিলতা ইংরেজদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেন।

পাঠ-পরিচিতি

'একুশের কবিতা' কবির 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

একুশের কবিতায় ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা মাতৃভাষার জন্য সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অতীতে যাঁরা জীবন দিয়েছেন কবি তাঁদের কথাও উল্লেখ করেছেন। অতীতের মহান আত্মত্যাগের ফলেই এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে অতীতের ত্যাগ আর ভবিষ্যতের প্রেরণা প্রতিফলিত হয়।

কবিতাটিতে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের পরিবেশ এবং জাতীয় জীবনে এর সুমহান তাৎপর্য সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি যেন ভাষা শহীদের রক্তে রঞ্জিত। অতীত আর বর্তমানের সংগ্রামী চেতনা শহীদ দিবসে প্রতিফলিত হয় এবং বাঙালি জাতি সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।

কবিতাটি পাঠের মাধ্যমে অমর ভাষা-শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা জানা যাবে।

পাঠের উদ্দেশ্য

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য এদেশের তরুণরা রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে। এ কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা অমর ভাষা-শহীদদের কথা জানবে। নিজের দেশ ও ভাষার প্রতি তাদের মমত্ববোধ জাগবে। সেই সঙ্গে তারা এদেশের বীর স্বাধীনতা-সৈনিকদের কথাও জানতে পারবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলায় কী ঘটেছিল?

ক. বরকতের রক্ত ঝরেছিল
খ. ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল
গ. তিতুমীরের কন্যা মিছিল করেছিল
ঘ. কৃষ্ণচূড়ার ডাল লাল হয়েছিল

প্রভাতফেরি হচ্ছে-

i. ভোরের হাওয়ায় মানুষের মিছিল
ii. শহীদদের স্মরণে দুপুরের মিছিল
iii. শহীদদের স্মরণে ভোরের মিছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. i ও iii　　ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাঙালি তার আবেগমাখা স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রেখেছে স্থাপত্য স্তম্ভের মধ্য দিয়ে। চির উন্নত শির এই জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় বীরশ্রেষ্ঠদের কথা এবং বাঙালির আপোসহীন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিষ্ঠ অভিব্যক্তির কথা। এই স্মৃতিস্তম্ভ স্মরণ করে বাঙালির দীর্ঘ কালের আত্মত্যাগ ও মহিমার স্বরূপকে। এই জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর সেনানীদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষেরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়।

ক. একুশের কবিতা কাদের উদ্দেশে লেখা হয়েছে?
খ. কবিতায় মুক্ত বাতাস বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে একুশের কবিতার মূলভাব কীভাবে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাঙালির আপোসহীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিষ্ঠ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়–একুশের কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

নিমন্ত্রণ

আশরাফ সিদ্দিকী

আমার বাড়ির গাঁয়ের পথে সবুজ মাঠের ধারে
অদূর বনের হাতছানি তাই মন যে সদাই কাড়ে!
সকাল সাঁঝে আপন কাজে রাখাল গেয়ে যায়–
হাওয়ায় দুলি ধানের শিষে ডাক দে বলে আয়!

হেথায় দূরে খালের ধারে ঝাউ–এর বনের ফাঁকে
বিজন রাতে নিতুই প্রাতে ডাহুক স্নেহে ডাকে!
দিনের শেষে লোহিত বেশে বিশ্ব যবে সাজে–
চাষিরা সব ফেরে ঘরে ক্ষান্ত দিয়ে কাজে!

পাখির মুখে হাওয়ার বুকে সাঁঝের খুশি ঝরে–
বাজিয়ে বেণু চরিয়ে ধেনু রাখাল ফেরে ঘরে!
বনের মাথায় আকাশ নামে তারার ফুল ফোটে
বন্ধুরা মোর! আসবে হেথায়? আনব সে ফুল লুটে!

হেথায় আছে কাজলা দিঘি–হিজল বনের পাশে–
ছায়ায় ঘেরা শীতল নীরে রক্তকমল হাসে!
কমল বনে কাটব সাঁতার–খেলব তাই তাই
পল্লী দুলাল ডাকছে তোমায়–ডাকছে তোমায় ভাই!

গাঁয়ের ধারে বিলের পারে পদ্ম ভরা জলে–
শাপলা শালুক কলমি কমল সবুজ থরে ফলে!
সেথায় চরে হাজার পাখি নিতুই দিবস ভর
সাঁঝের মায়ায় কল্পপুরীর নামে তেপান্তর!

বর্ষাদিনে পল্লী ভাসে চতুর্দিকে বারি–
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর দেয় না খেয়া পাড়ি।
সাঁঝের রবি অদূর বনে অস্তাচলে যায়
চতুর্দিকে বাজে বাঁশি–ডাকে ওরে আয়!

কবি-পরিচিতি

আশরাফ সিদ্দিকী টাঙ্গাইল জেলার নাগবাড়িতে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.এ ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল লোকসাহিত্য। তিনি পেশাগত দিক থেকে সরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ের অধ্যাপক, কলেজের অধ্যক্ষ ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ইত্যাদি পদে চাকরি করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

আশরাফ সিদ্দিকী কবি হিসেবে সাহিত্যের অঙ্গনে আগমন করেন। তবে তিনি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে গল্প, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, অনুবাদ ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লেখা বইগুলো হল– কবিতা : তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, সাত ভাই চম্পা, বিষ কন্যা, উত্তর আকাশের তারা, তিরিশ বসন্তের ফুল, কুঁচ বরণের কন্যে, ঝড় তুফানে ইত্যাদি। তাঁর **গল্পের বই** : রাবেয়া আপা ও অন্যান্য গল্প। শিল্প সাহিত্যে তাঁর অবদান : কাগজের নৌকা, সিংহের মামা ভোম্বল দাস, আমার দেশের রূপকাহিনী, বাণিজ্যেতে যাব আমি। তাঁর **প্রবন্ধের বই** : লোকসাহিত্য, কিংবদন্তির বাংলা, শুভ নববর্ষ, লোকায়ত বাংলা। **স্মৃতিকথার বই** : রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, যা দেখেছি, যা পেয়েছি। এসব ছাড়াও তিনি ইংরেজি থেকে বেশ কিছু অনুবাদও করেছেন।

সাহিত্যসাধনার জন্য আশরাফ সিদ্দিকী অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : শিশু সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, দাউদ সাহিত্য পুরস্কার ও ইউনেস্কো পুরস্কার।

শব্দার্থ

নিমন্ত্রণ – দাওয়াত, আমন্ত্রণ।
অদূর – খুব দূরে নয়, কাছাকাছি।
হাতছানি – হাতের ইশারা।
সদাই – সব সময়।
সাঁঝে – সন্ধ্যায়।
রাখাল – মাঠে গরু চরায় যে।
নিতুই – নিত্য, প্রতিদিন।
প্রাতে – প্রভাতে, সকালবেলায়।
লোহিত – লাল রং।
ক্ষান্ত – থেমে যাওয়া, শেষ করা।
বেণু – বাঁশ, বাঁশি।
ধেনু – গরু।
নীর – পানি।
রক্তকমল – লাল পদ্ম।
কমল – পদ্ম ফুল।
দুলাল – আদরের ছেলে।
দিবস – দিন।
থরে – স্তরে।
বারি – পানি
অস্তাচলে – পশ্চিম আকাশে, যেখানে সূর্য ডোবে।

টীকা

কল্পপুরী – কল্পনার জগৎ, যেখানে যা ইচ্ছা কল্পনা করা যায়।

তেপান্তর – বহুদূরব্যাপী জনহীন বিশাল মাঠ, রূপকথার গল্পে এই মাঠের কথা আছে।

দিনের শেষে লোহিত বেশে– দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডোবে। তখন লাল রঙে আকাশকে রাঙিয়ে তোলে। কবি কল্পনা করেছেন, দিনের শেষে পৃথিবী যেন নতুন সাজে সেজেছে।

ছায়ায় ঘেরা শীতল নীরে রক্ত কমল ভাসে–গাঁয়ের দিঘির জলে লাল পদ্মফুল ফোটে। দিঘির চারপাশ গাছ–গাছালিতে ভরা বলে দিঘির পানি খুবই শীতল। সেই শীতল পানি শরীর ও মন জুড়িয়ে দেয়।

খেয়া পাড়ি–নদীতে নৌকা দিয়ে এক পাড় থেকে অপর পাড়ে যাওয়া।

পাঠ-পরিচিতি

'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কবির 'কাগজের নৌকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কবিতাটিতে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির একটি চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কবিতাটিতে সবুজ মাঠের ধারে গাঁয়ের বাড়িতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। গাঁয়ে গেলে সেখানকার অপূর্ব সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করবে। তখন মনে আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না। গাঁয়ের সৌন্দর্যের শেষ নেই। রাখাল ছেলের আনন্দের জীবন সেখানে মন টেনে নেয়। গাঁয়ের শান্ত নীরব জীবন কতই না আনন্দের। গাছ-গাছালি, ফুলফল, পাখ-পাখালি সবাই মিলে গ্রামকে কত সুন্দর করেছে। বিলের পানিতে শাপলা ফোটে। বৃষ্টির দিনে মন ভরে ওঠে খুশিতে। গাঁয়ের এই অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে পরম আনন্দে কাটাবার জন্য কবি তাঁর শহরের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

পাঠের উদ্দেশ্য

কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা পল্লীপ্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারা পল্লীপ্রকৃতির বর্ণনা দিতে পারবে এবং কবিতাটি আবৃত্তি করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. "নিমন্ত্রণ" কবিতাটি আশরাফ সিদ্দিকীর কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

ক. সাত ভাই চম্পা
খ. বিষ কন্যা
গ. কাগজের নৌকা
ঘ. তিরিশ বসন্তের ফুল

২. এই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে–

ক. বাঙালির আতিথেয়তা
খ. বর্ষার সৌন্দর্যের কথা
গ. পল্লীর জীবনযাত্রা
ঘ. পল্লীপ্রকৃতি ও রূপবৈচিত্র্য

৩. দিনের শেষ ছাড়া আর কখন বিশ্বপ্রকৃতি লোহিত বেশ ধারণ করে?

ক. ধলপ্রহরে
খ. প্রভাতে
গ. মধ্যাহ্নে
ঘ. অপরাহ্নে

৪. কবিতাটি পাঠে আমাদের মনে কোন ভাবের উদয় হয়?

ক. প্রকৃতির জন্য আকর্ষণ
খ. পল্লীর প্রতি আকর্ষণ
গ. শহরের প্রতি বিমুখতা
ঘ. দেশের জন্য মমত্ব

সৃজনশীল প্রশ্ন

কবিতাংশটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পাখির মুখে হওয়ার বুকে সাঁঝের খুশি ঝরে–
বাজিয়ে বেণু চরিয়ে ধেনু রাখাল ফেরে ঘরে!
বনের মাথায় আকাশ নামে তারার ফুল ফোটে
বন্ধুরা মোর! আসবে হেথায়? আনব সে ফুল লুটে!

ক. উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?
খ. "সাঁঝের খুশি" বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন–আলোচনা কর।
গ. উদ্ধৃতাংশে বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে সকালবেলার কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠার সময়ের তুলনা কর।
ঘ. 'বন্ধুরা মোর! আসবে হেথায়?'–কবির এ আহ্বানের মর্মার্থ বিশ্লেষণ কর।